‘হে ভারতভূমি, ভুলিও না তুমি শত শহীদের স্বর্গ’

নার্সারির ব্যবসায় সবুজায়ন ও কর্মসংস্থান

কোন পথে চলেছে দার্জিলিং পাহাড় ?

এখন ডুয়ার্স

১-১৫ আগস্ট ২০১৭। ১২ টাকা

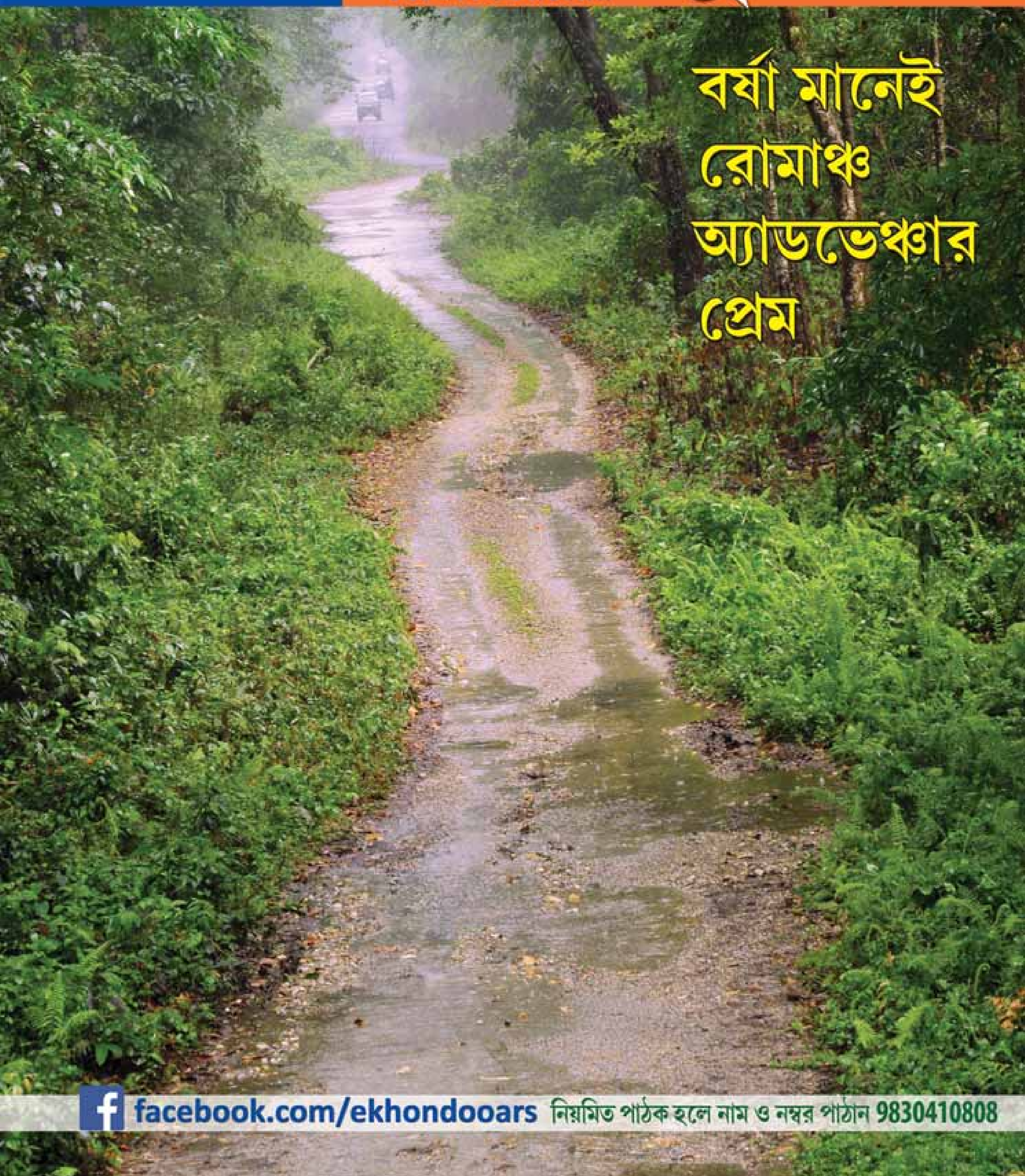

বর্ষা মানেই রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার প্রেম

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে **কোষ্ঠকাঠিন্য** অন্যতম................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি কয়েকদিন হল বৃষ্টিতে ভিজছে সারাদিন ধরে। প্রবল বর্ষায় জল জমে যাওয়া ছাড়াও একটু বৃষ্টিতেই ডুবে যেত শহরের পথঘাট। কিন্তু এখন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কালভার্টগুলো অনেকাংশেই সামলে নিচ্ছে এই জলপ্রবাহ। মিউনিসিপ্যালিটি শহরের জলপ্রবাহের গতিবিধি অনুযায়ী এমনভাবে নিকাশি ব্যবস্থা পরিমার্জিত করার প্রয়াস করেছে তা সত্যিই উল্লেখ করার মতো। বিভিন্ন ওয়ার্ডে হাই ড্রেনের ব্যবস্থা করে শহরকে বর্ষাতেও যাতে পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, সেদিকে তৎপর।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।
এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

সম্পাদকের ডুয়ার্স

বোশেখ-জষ্ঠিতে গ্রীষ্মের করাল দৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে দাপাদাপির পর উত্তরে পৌঁছয় খানিক দেরিতে। তখন উত্তর জুড়ে বর্ষার অপরাজিত ব্যাটিং, নদীনালা টইটুম্বুর। ফোর লেন হাইওয়ে তৈরির কর্মযজ্ঞ ভণ্ডুল হওয়ার যোগাড়, নদীর চর থেকে শ্রমিকদের অস্থায়ী আস্তানা রাতারাতি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, বড় বড় লোহার শিক বের করে হাসছে নির্মীয়মান নতুন সেতু। হঠাৎই যেন তার বিরতি টানে প্রখর গ্রীষ্ম, যেন এনজেপি-তে নেমেই রণ হুংকার, পর পর বাউন্সারে কাত পেলব বর্ষা। আকাশ থেকে মেঘ টেঘ সব উধাও, দিনভর চাঁদিফাটা রোদে ফুটিফাটা জঙ্গল-নদী-পথ-ঘাট। প্রতিবেশী আসামে যখন গলা অবধি ডুবে খাবি খাচ্ছে বানের তোড়ে, তখন হাঁসফাস করছে বাংলার ডুয়ার্স। উষ্ণতা আর আর্দ্রতা পাল্লা দিয়ে ছুটছে উপরের দিকে, আটত্রিশেই বাহান্নর অনুভূতি। মেঘেদের মতই এসি-মিস্ত্রির দুষ্প্রাপ্যতা উসকে দিচ্ছে বাল্যস্মৃতি। ভরদুপুরে পান্তাভাতে পেট পুরে ঘাম জবজবে দিবানিদ্রার আহ্বান। এই অকাল গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে অসহায় প্রতিবাদে ফেটে চৌচির ফেসবুকের দেওয়াল। ফোর লেন বানাতে গিয়ে শয়ে শয়ে বৃক্ষ ছেদনই যে এর মূল কারণ চেতনাসম্পন্ন মানুষের রায়ে তাই বের হল।

ঠিক সেই সময়ই শাওন এল। মাঠের চারপাশে গ্যালারিতে অপেক্ষমান অধৈর্য্য মেঘের দল ঘিরে ফেলল আকাশ। শীতল হাওয়ায় জুড়িয়ে যেতে থাকল দগ্ধ শরীর ও মন। মঞ্চে আবার হাজির রূপসী বর্ষা, তবে নুপুরের আওয়াজ আরেকবার সূচনা করল সুন্দরের জয়গান। শতসহস্র টিনের চালে সেই গান ডুয়ার্সবাসীদের নিয়ে যায় সুখনিদ্রায় চেপে কোনও রূপকথার দেশে। প্রকৃতির প্রকৃত বিচিত্র রূপ এসময় ডুয়ার্সকে রহস্যময়ী করে তোলে গাঢ় সবুজের ভিন্নতায়। জলভরা মাঠে কৃষক পরিবার ব্যস্ত ধান বুনতে, ডোবার জলে পচতে থাকে পাটগাছ।

ডুয়ার্সে এসময় সুলভ স্পেশাল পাটশাক, কাঁঠাল বিচি, আটিয়া কলার মোচা আর নদীর ছোট ছোট মাছ। মেনি, রিঠা, খোরশলা, গোলসা ট্যাংরা আরও কত কী! বুড়ি পিসিমা এবারও বৈশাখে ছানি চোখে কষ্টে-সৃষ্টে খানিক কাসুন্দি করে পাঠিয়েছিলেন, চলে যাওয়ার আগে এই নাকি শেষ। সে কাসুন্দি পাটশাক ভাজার সোয়াদকে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। ডোবা-তেলে ভাজা কিংবা কলাই ডালে বা ডাটার ঝোলে নিরীহ সেদ্ধ কাঁঠাল বিচি পৃথিবীর যে কোনও সেরা এথনিক ডিশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। আটিয়া কলার মোচার গন্ধে এমনিতেই ভরে যায় ঘর, স্বাদ নিয়ে আলোচনা নিস্প্রয়োজন। ঠিক যেমন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে বিখ্যাত ঢেকিশাক আর বোরোলি মাছ নিয়ে আজ নতুন কিছু বলার নেই, ছোট্ট একটি দাবি ছাড়া— এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি!

চতুর্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১-১৫ অগস্ট ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
উত্তরপক্ষ ৮
নার্সারির ব্যবসা সবুজায়নকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ১৪
ডানকানদের বাগান পরিচর্যায় অবহেলার পরিণতি উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি ও আজকের সংকট!
রাজনীতি
'হে ভারতভূমি, ভুলিও না তুমি শত শহীদের স্বর্গ' ২০
কোন পথে চলেছে দার্জিলিং পাহাড়? ২২
ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৭
দিনবাজার: শতবাজার বিকশিত হোক
এখন ডুয়ার্স স্পেশাল
বহিরাগত শিল্পীদের জন্য মার খাচ্ছে স্থানীয় প্রতিমা নির্মাণ শিল্পীরা!! ৪১
ডুয়ার্স বিচিত্রা
রাজবংশী ব্রতনাট্য ৩৮
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১০
তরাই উৎরাই ২৪
লাল চন্দন নীল ছবি ২৯
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩২
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৩৬
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪০
শ্রীমতী ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬
ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন
অরবিন্দ কর ৪২

প্রচ্ছদ ছবি: ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

আরেব্বাস!

পুকুর না হলেও কাছাকাছি তো বটেই! আস্ত একখান বাস গো দাদা! ট্রিপ শেষ করে ডেরাইভারজি ধূপগুড়ি স্ট্যান্ডে বাস রেখে গিয়েছিলেন চা খেতে। সামনেই সত্তর ফুটের মধ্যে বাসবাবু তখন চুপচাপ চতুর্চাকায় দাঁড়িয়ে ঠান্ডা হচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি ভ্যানিশ! ডেরাইভার তো চমকে চুম্বক! বাস তো গোরু নয় যে ঘাস দেখে এগিয়ে যাবে। ডেরাইভারের পারমিশন ছাড়া ব্যাটা কি একা একাই তবে পাম্পে গেল পেট্রোল গিলতে? খোঁজ খোঁজ! কিন্তু বাস নাই! দিনেদুপুরে লোকচক্ষুর সামনে আস্ত বাস ভ্যানিশ হলে তারপর যা হওয়ার তা শুরু হল। শিলিগুড়ি থেকে একটা বাস, থুড়ি তার চালক জানাল, সে বাসকে আসার সময় তালমা স্টপে খাড়া থাকতে দেখেছে। অমনি শুরু হল গবেষণা, থুড়ি বাসেষণা। শেষে রাজগঞ্জ থেকে খবর এল যে, পাওয়া গিয়েছে ব্যাটাকে! বাস স্টপে একা একা খাড়া হয়ে আছে। সামনে 'রিজার্ভ' লেখা বোর্ড। তারপর ঘরের বাস ঘরেই এসেছে। কিন্তু বাস কেন এভাবে বাঁশ দিতে চাইছিল?

অহিংস উদ্ধার

ব্যাঙ্ককে পটিয়ে কিছু পাবলিক 'শোধ দেব' বলে সে-ই যে মোটা মানি নিয়ে বাড়িতে বসে টিভি দেখতে গিয়েছেন— আর ফিরছেন না। লোন নিয়ে অ্যালোন হয়ে আছেন যেন। সে মানি উদ্ধারের জন্য ব্যাঙ্কবাবুরা ভারী নিরীহ ফন্দি এঁটেছেন। সটান গান্ধিবাবার আশ্রয় নিয়েছেন একেবারে। আপিসে সই করে দল বেঁধে ভারী নিরীহ মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ছেন খাতকের চকচকে বাড়ির সামনে। হাতে প্ল্যাকার্ড। তাঁর লেখাগুলো মোটামুটি এইরকম— 'হে পরমোদ্যগী কর্মবীর মহাশয়! অসহায়-অবলা মনুষ্যদের অর্থের অভাবে লোন দিতে পারিতেছি না। এমতাবস্থায় আপনি ফিরত না দিলে উহারা আত্মপটোল তুলিতে হেজিটেট করিবে না।' ছলছল চোখে, বিনয়ের অবতার হয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ফল অবশ্য মোক্ষম! মানসংকটে পড়ে মানি ফেরত দিচ্ছেন গৃহকর্তা। অতএব গান্ধিগিরি চলছে, চলবে। মালদায়।

পথে বসা

পাবলিক না হয় চিটফান্ডে হিট খেলে পথে বসে। তা সে কেন বসে? মানুষ বলেই না বসে! তবে কেবল বসে না, বসায়ও। যেমন মাথাভাঙা ব্লকে সে দিন কে জানি নিজে চেয়ারে বসে নিজের আপিসকে পথে বসিয়ে দিয়েছিলেন— মানে আপিস থেকে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসেছিলেন পথে— ঠিক পথে নয়, পথের পাশে। তা না বসিয়ে কি উপায় ছিল রে পাগলা! কৃষক এসে বলছে, বীজ দাও। বীজ গোডাউনে চাবিবন্ধ। চাবি চেয়ে পাচ্ছেন না। কৃষক খেপে যাচ্ছে। এ এক ঘোরতর অশান্তি। মনে মনে 'মন রে কৃষিকাজ জানো না' গেয়েও চাপ কমানো যাচ্ছে না। অতএব 'পথে এবার নামো সাথি' স্মরণ করে আপিসকেই পথে বসিয়েছে— মানে, পথেই বসিয়েছে আপিস। বসতেই হেব্বি হইচই! এর পর কী হয়েছে, তিনি কি পেয়েছেন কি না— এসব খুচরোয় গৌণ।

জলেই ভরে যাবি

পুলিশ নাকি বারবার বলেছিল, 'এসব সার্কাস-মেলা নয়কো! দেখিসনে।' তা শুনলে তো সে কথা। ভালো মুখে বললে পুলিশের কথা কে-ই কবে শুনেছে? তা পুলিশও দু'বার না করেনি। আসলে অনেকদিন পর টাউনের পুলিশ লাইনের মাঠে দলে দলে পুলিশ অস্ত্র প্র্যাকটিস করতে নামল কি না— তা-ই দেখতে যাওয়ার লোকের অভাব হল না। তারপর খেলা দেখার কারণে চোখে অ্যায়সা চাপ পড়ল যে, কেঁদে কূল পায় না! পুলিশের মুখে মিচকে হাসি। যেন বলছে 'দেখ, দেখতে কেমন লাগে!' কিন্তু কী দেখেছিল পাবলিক টাউনের পুলিশক্ষেত্রে? পুলিশ কি তাদের চাঁদমারি বানিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস করতে চেয়েছিল? সামনে এত পাবলিক পেয়ে লাঠি চালানোর কলাকৌশল দেখিয়েছিল কি? আরে, না কত্তা! পাবলিক ফুল এনার্জি নিয়ে টিয়ার গ্যাস ফাটানোর প্র্যাকটিস দেখতে গিয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে দোকান থেকে জলের বোতল কিনে চোখে ঢেলেছে। কন দেখি! টিয়ার গ্যাস ফাটানো কি দেখা যায়? আরে বোকা, দেখবি কী— জলেই ভরে যাবি!

অনস্পৃশ্যতা

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে সদলবলে হামলা চালাচ্ছিলেন তেনারা। সঙ্গে গুটিকয়

ছেলেমেয়ে। তাদের ফুর্তির আবার শেষ নেই। তা অতিফূর্তির ফলে যা হয়— দুটো বাচ্চা পড়ল ছোট একটা সিমেন্ট বাঁধানো ডোবায়। তা জোড়া বাচ্চাকে তোলা কি চাট্টিখানি কথা মামা! খবর দে। গাড়ি আন। ক্রেন আন। সব এলে তারপর তোলা গেল দুই বিচ্ছুকে। দলের সদস্যরা দূরে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখছিল, বাচ্চা বাঁচে না মরে। তবে দোপেয়েদের ছোঁয়া লেগে যায় বলে বাচ্চা ফেরত নেওয়ার প্রশ্নই নেই। তবুও জল থেকে তোলা দুই ছানাকে মায়েদের দলে ফেরত দেওয়ার চেষ্টা তো করতেই হবে। গম্মেন্টের লোক করল। তাজ্জব কি বাত! বাচ্চাকে কয়েকবার শুঁকে দিব্যি ফেরত নিয়ে নিল মায়েরা। এ তো অসম্ভব ব্যাপার কাকা!

হাউ পসিব্‌ল? তবে কি দোপেয়ে-চারপেয়েদের জাতিগত বিদ্বেষ মেটার যুগ শুরু? গুরু!

যোগ্যতা

সিভিক পুলিশে কাজ করার ফর্ম জোগাড় করতে গিয়ে খুব নাকানিচোবানি খেয়েছেন হবু সিভিকরা। কোথাও ঝাঁ ঝাঁ গরমে বিনে পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। কোথাও বাহুবলী প্রার্থী লাইনের শেষে না দাঁড়িয়ে সামনে গুঁতো মেরে ঢোকার চেষ্টা করেছে। কোথাও তাঁদের পৃষ্ঠ চুম্বন করেছে পুলিশের যষ্টি। ঘর্মাক্ত, পিপাসার্ত, পিটিত, লাইনভঙ্গ হতে হতে রেগে লাল হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। তারপর উজির যখন হুকুম দিলেন, পুর ভোট না মিটলে এসব করা যাবে না, তখন নাকি অনেক প্রার্থী কেঁদে ভাসিয়েছেন। কিন্তু কেন এই নির্যাতন? জবাবে নাকি খাঁটি এবং রসিক পুলিশরা মিচকে হেসে বলেছেন, ‘এসব তুচ্ছ ব্যাপারে বিচলিত হলে বুঝতে হবে, পুলিশ হওয়ার যোগ্যতাই নেই।’ তা বটে! তা বটে!

ধর্মথানা

শুনলুম, আশপাশের নাকি কাছে-দূরের কোনও থানায় নাকি পাবলিক জুতো খুলে ঢুকছেন! পুলিশ অবশ্য জুতোহীন নয়। তাহলে কী হয়েছিল সেখানে? এটাই তো জানতে চাইছি দাদা, হলটা কী? ধরো, জুতো খুলে ঢুকলে থানা স্বচ্ছ থাকবে— তাহলে তো সবাই নগ্নপদী হত! কেউ কেউ বলছেন যে, থানেদার দিদিমণি নাকি ফরমান দিয়েছে— ‘পুট অফ ইয়োর শু বিফোর অভিযোগ’! সে শুনে এলাকার মহানাগরিক রেগে আলুর দম হয়ে বলেছেন যে, যেহেতু থানা নামক বস্তু দেবস্থান গোত্রের নয়, অতএব জুতো খোলা কম্পালসারি নহে। প্রতিবাদে নাকি থানেদার বলেছেন যে, তিনি মোটেই এসব ফরমান জারি করেননি। সব বিরোধীদের চক্রান্ত। পাপীরা বলছেন যে, জুতো খুলে থানায় ঢুকতে ঢুকতে একদিন পাবলিকের মনে হবে, থানা হল মন্দির। ফলে থানার প্রতি ভক্তি বাড়বে। —কী শয়তান দেখো!

টুক্রাণু

হাতিদের গুন্ডামি এবং অজগরদের গ্রেপ্তার হওয়া চলছে। বালুরঘাটে এখনও দাঁড়াতে পারেননি খ্যাতনামা সৌরভ গাঙ্গুলি। মালবাজারে নতুন টোটো নট অ্যালাও। জাল দু'হাজারের পর জাল মার্কিন ডলার মিলছে বালুরঘাটে। বর্ষার দিনে ময়নাগুড়ি রোড স্টেশনে ঢুকতে চাইলে নাকি ফিজিক্যাল ফিটনেস চেক করে নেওয়াটা ভালো। আলিপুর পুরসভার এক

কাউন্সিলর ফেরার হয়ে ওয়ার্ডকে পথে বসিয়েছেন। অনলাইনে ফোনের অর্ডার দিয়ে টাকা মিটিয়ে পাথরের টুকরো পেলেন মালবাজারের ক্রেতা। খড়ের গাদায় ছুঁচের বদলে আধ ডজন বোমা খুঁজে পেল পুন্ডিবাড়ির পুলিশ। পাহাড় আন্দোলনে এবং ডুয়ার্স রোদ্দুরে পুড়ছে। পা পিছলে পড়লেও হস্তধৃত ডিম অটুট রেখে কেবল মাথা ফাটিয়েছেন কালচিনির হাটুরে।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬৮৩৯৮৮

চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা
নেপাল সাহা ৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

নার্সারির ব্যবসা সবুজায়নকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে

ডুয়ার্সে এখন ঘোর বর্ষা। তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা, তোর্সা, রায়ডাক ইত্যাদি নদীগুলোর টুকটাক ভাঙন চলছে। বেশ কিছু মৃতপ্রায় নদী অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত বুকে নিয়ে ফুলেফেঁপে উঠেছে। বিচিত্র চরিত্র এইসব পাহাড়ি নদীর। দু'দিন রোদ থাকলেই নদী বিপদসীমামুক্ত। তবে কিছু নদীতে আবার জলস্তর কমতে থাকলেই পাড় ভাঙা শুরু হয়। বৃষ্টির তেজ একটু বাড়লেই নদীর চরে বসবাসকারী মানুষদের রাত জেগে পাহারার কাজ চলে। বিপদের আশঙ্কায় নদীর বাঁধে, ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনটাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

এখন ডুয়ার্স এলাকায় একটা কাজে কিন্তু গতি পায়। বৃষ্টি একটু কম, কিন্তু মাটি ভেজা ও সরস থাকলে চা-বাগান এলাকা এবং বনভূমিতে চারাগাছ লাগানোর বিশাল কর্মকাণ্ড চলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন

অজিত সেন তার নার্সারিতে কর্মরত

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

বিভাগ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সুন্দর সুন্দর ট্যাবলো-সহ নগর পরিক্রমার আয়োজন করে এবং বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করে। বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বৃক্ষরোপণ উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বৈদ্যুতিন বা প্রিন্ট মিডিয়ায় সুন্দর সমস্ত ছবি ও সংবাদ পরিবেশিত হয়। এসবে কিন্তু ডুয়ার্সের মানুষ বহু ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট নয়।

হুসলুরডাঙা গ্রামের যতীন রায় অল্প জমির মালিক। বয়স হয়েছে। ওঁর সঙ্গে রানিরহাট মোড়ে একটা ছোট চায়ের দোকানে কথা হচ্ছিল। উনি বলছিলেন, 'এখন ডুয়ার্সে হইহই করে ফোর লেনের রাস্তা এবং এশিয়ান হাইওয়ের কাজ চলছে। কত পুরনো গাছ যে কাটা গেল, তার হিসাব কে রাখে?' তিনি শৈশবকাল থেকে গাছগুলোর সঙ্গে বড় হয়ে, আজ জীবনসীমার প্রান্তে। তাঁর ক্ষোভ— 'রাস্তা হোক, কিন্তু নতুন চারাগাছ লাগানোর ব্যবস্থা হোক, তবেই গাছ কাটা যেতে পারে, নইলে নয়।' ওই চায়ের দোকানে নিবারণবাবু, সপেনবাবু ও আরও অনেকে একই সুরে সুর মেলালেন।

প্রয়াত দেবব্রত ঘোষ একজন কৃষিবিজ্ঞানী এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন। কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় কাজ করেছেন। একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এমন অবৈজ্ঞানিকভাবে সার ও কীটনাশক প্রয়োগে কৃষিজমি ধ্বংস হয়ে যাবে। তার চেয়ে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক হারে কাঁঠাল গাছ লাগালে ১০ বছরের মধ্যে অর্থনীতিই পালটে যাবে।'

গাছের চারা উৎপাদন এবং বিক্রি করা যাঁদের জীবন ও জীবিকা, এমন একজন মানুষ অজিত সেন। জলপাইগুড়ি শহরের প্রান্তে তিস্তা নদীর পাড়ে সেন পাড়ায় বাস। সন্তানসন্ততি নিয়ে ভরা সংসার। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ, কিন্তু ডিবিসি রোডে দোকানের বারান্দায় বা রাস্তার কোণে চারাগাছ বিক্রি করতে তিনি স্বচ্ছন্দ। বাড়িতে বেশ বড়সড়ো একটা নার্সারি। উনি নানারকম চারা তৈরি করেন, যেমন মরশুমি ফুল, পাতাবাহার, ভেষজ গাছ এবং ছায়াগাছের চারা। তা ছাড়াও কিছু ফলগাছের চারাও তৈরি এবং বিক্রি করে থাকেন।

পরিবারের সবাই এই কাজে অজিতবাবুকে সাহায্য করেন। আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই যে রাস্তার ধারে বসে চারা বিক্রি করেন, লজ্জা বা সংকোচ বোধ হয় না?' সোজাসাপটা উত্তর, 'চুরি তো করি না। পরিশ্রম করে রোজগার করে ছ'-সাতজনের পেটের ভাত জোটাই। কীসের সংকোচ?' তবে অজিতবাবুর মূল ব্যবসা কিন্তু মরশুমি ফুলের চারা। তা ছাড়া বাড়িতে পনেরো কাঠা জমিতে চারাগাছ তৈরি করেন। তাঁর তৈরি ফুলগাছ বহু প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে এবং পুরস্কৃত হয়েছে। উনি বলছিলেন, এই শহরে এবং তার আশপাশে প্রায় ২৫টি পরিবার চারাগাছ তৈরির কাজে যুক্ত আছে। প্রত্যেকেই কিন্তু সংসার এবং পরিবার প্রতিপালন করছে। খুব আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করলে এই জীবিকায় ভাতের অভাব নেই। ওঁর বাড়িটিও ধীরে ধীরে দালানের রূপ নিচ্ছে।

জলপাইগুড়ি শহরের বাইরে হলদিবাড়ির রাস্তায় হাসান মিঞা প্রায় এক বিঘা জমিতে শুধুমাত্র সুপারির চারা তৈরি করেন। তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি, কিন্তু সে দিন হাসানভাই বাড়ি ছিলেন না। ঘোমটা মাথায় ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম। সুপারির চারা তৈরি পরিবারটির মূল জীবিকা। তা ছাড়া কিছু গোরু-ছাগলও আছে। পথে টোটোতে একজন বললেন, 'পঞ্চায়েত থেকে অর্ডার পাব— এই ভরসায় নার্সারির কাজ করলে কিন্তু বিপদ আছে।' টুকটাক বিক্রির ভরসায় এক বিঘা জমিতে সুপারির চারা তৈরিতে কি তাহলে কিছুটা ঝুঁকি আছে? লোকটির সোজা উত্তর— 'ঝুঁকি আছে তো বটেই।' আমার মনে হয়, সমস্ত

ব্যবসাতেই ঝুঁকি থাকে— তা বলে ব্যবসা থেমে থাকে না।

কিছুদিন আগে নতুন নতুন চা-বাগান তৈরি হচ্ছিল। ক্ষুদ্র চা-বাগান উত্তরবঙ্গের একটা বিস্তীর্ণ অংশের অর্থনৈতিক চেহারা পালটে দিয়েছে। কৃষিজমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেআইনিভাবে রূপান্তর ঘটিয়ে ছোট ছোট চা-বাগিচা তৈরি হয়েছে। কয়েক ডজন চা তৈরির ফ্যাক্টরি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের কর্মসংস্থান অবশ্যই হয়েছে। নতুন এই চা-বাগিচাগুলির শুরুতে প্রচুর চারাগাছের চাহিদা ছিল। শিলিগুড়ি মহকুমার বাতাসি এবং জলপাইগুড়ি জেলার বাতাবাড়ি এলাকায় বেশ কিছু মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র চা-বাগিচা গোষ্ঠীর কর্মকর্তা বিজয়গোপাল চক্রবর্তী কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'এখন নতুন চা-বাগান তৈরির উৎসাহে ভাটা পড়ায় চায়ের চারাগাছ তৈরির কাজে আগের মতো রমরমা নেই।' এখন চারাগাছের (১০ ইঞ্চি উচ্চতার) মূল্য ২ টাকা থেকে ২ টাকা ৫০ পয়সার মধ্যে। এক বিঘা জমিতে এক বছর গভীর শ্রমদান করে গড়ে ৭৫ হাজার চারাগাছ তৈরি সম্ভব। ভাল বিক্রয়মূল্য পেলে বছরে ৫০ হাজার টাকা রোজগার হতেই পারে।

ভোটপট্টির বাসিন্দা মদন রায় উদ্যোগী মানুষ। প্রায় ৩০ বিঘা জমিতে তাঁদের চায়ের বাগান। চেষ্টা করছেন একটা চা তৈরির ফ্যাক্টরি করার। ইতিপূর্বে তিনি এক বিঘা জমিতে চায়ের চারাগাছ তৈরি করেছেন ৮০ হাজার। উনি বলছিলেন এই প্রকল্পে প্রাথমিক বিনিয়োগ অত্যন্ত বেশি। মাটি শোধন, সার দিয়ে পলিথিনের পট তৈরি করে উন্নতমানের কাটিং বসাতে হয়। বর্ষা শেষে কাটিং বসানোর সময়। তারপর নিয়মিত দেখভাল করা, সেচের ব্যবস্থা করা, কখনও ছায়ার ব্যবস্থাও করতে হয়। আর বিক্রির দাম ২.২০ টাকা থেকে ২.৩০ টাকা। এখানেও দালালরাজ বহাল। কিছু ফড়ে বাতাসি থেকে চারা এনে বিক্রি করে। শ্রমিকের আকাল— তাই মদন বর্তমানে চারার ব্যবসা করেন না।

দীনেশ বিশ্বাস তার নার্সারিতে

এই শহরে এবং তার আশপাশে প্রায় ২৫টি পরিবার চারাগাছ তৈরির কাজে যুক্ত আছে। প্রত্যেকেই কিন্তু সংসার এবং পরিবার প্রতিপালন করছে। খুব আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করলে এই জীবিকায় ভাতের অভাব নেই।

ডুয়ার্সে আমার দীর্ঘদিনের যাতায়াত। ১০-১২ বছর হল ময়নাগুড়ি রোডের লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করে উত্তরে এগলেই বিশ্বাসবাবুর নার্সারির সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। গাছপালায় দৃষ্টি আটকে যায়, কিন্তু অন্দরে প্রবেশ করা হয়ে ওঠেনি। এই বর্ষায় একদিন গনগনে সূর্যকে মাথায় নিয়ে বাপির সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসবাবুর নার্সারির অন্দরে। ওঁরা দুই ভাই। বড় ভাই দীনেশ বিশ্বাস ৫৫ বছরের তরুণ। সঙ্গে থাকেন ছোট ভাই অনিমেষ বিশ্বাস।

আসল বাড়ি জলঢাকার পাড়ে ধূপগুড়ি ব্লকের কুর্শামারি গ্রামে। ওখানে বেশ কিছু জমিতে চাষ-আবাদের কাজ হয়। ১৯৯২ সাল থেকে হার্ডওয়্যারের ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কবিতা লেখা যাঁর জীবনবোধ, সবুজ গাছপালা যাঁর জীবনের ভরসাস্থল, তাঁকে কীভাবে আটকে রাখবে শুকনো নীরস লোহালক্কড়ের ব্যবসা? ২০০৫ থেকে ময়নাগুড়ি রোডে চালু হল তাঁর নার্সারির ব্যবসা। বহুমুখী নার্সারি অর্থাৎ ফুল, ফরেস্ট্রি, ফল ইত্যাদির চারা তৈরি শুরু হল। নিজেই বিপণনে সময় দিলেন। বর্তমানের আসাম ও মেঘালয়ে তাঁর ব্যবসা ছড়ানো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর, উদ্যানপালন দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর, বন দপ্তর বিশ্বাসবাবুর নার্সারিকে বিপুল সহযোগিতা করে। প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানে ১৫ জনের কর্মসংস্থান করছেন— তা ছাড়া আরও প্রায় ১০০ জন এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। উনি স্বনির্ভর দলের মহিলা সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে প্রস্তুত আছেন। পরিত্যক্ত সরকারি জায়গায় তেজপাতার বাগান তৈরি করছেন।

কিছু পত্রপত্রিকায় দীনেশবাবুকে নিয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। দূরদর্শন তাঁর সাক্ষাৎকার সম্প্রসারণ করেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে তিনি স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে চারাগাছ সরবরাহ করেছেন। নানা সরকারি পুরস্কারে তিনি ভূষিত। অবসরে কবিতা লেখা চলছে। আমাদের এগিয়ে দিতে এসে একটা লম্বা কবিতা শুনিয়েছেন—

'আমি যদি গাছ হতাম দিতাম শীতল হাওয়া
ফল আর ফুল,
দিতে পারতাম জ্বালানি আর উষ্ণায়নমুক্ত
এক সুন্দর পৃথিবী।'

একটু খেপা না হলে এই কাজে এত আনন্দ পাওয়া যেত না।

জাতীয় মহাসড়ক দপ্তরের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর রাজকুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, ডালখোলা থেকে সলসলাবাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় যত বৃক্ষনিধন হয়েছে, তার পাঁচ গুণ বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে। এই ভরসায়ই তো বেঁচে থাকা।

দেবপ্রসাদ রায়

ফুটবল ছাড়া লাটিন আমেরিকার আর সব দূরের জিনিস। সেই দূরের জিনিস কিউবাতে গিয়ে আরো ভালো করে বোঝা যেত স্প্যানিশ জানলে। তবে ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করেছিল আবেগ। লেখক গিয়েছিলেন কোন সমুদ্রে শান্তি স্থাপনের কথা বলতে— কিন্তু শুনলেন পরমাণু শৈত্যের কাহিনী। পৃথিবী ধ্বংস হলে একটা সাগরে শান্তি এনে কী হবে? এদিকে আবার রাশিয়াতে এসে সঙ্গী জানাল বিচিত্র ব্যারামের কথা। শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ বের হচ্ছে। দু'টি পর্বে এবার দু'রকম। দেশের দারিদ্রের অবস্থা মেয়েদের সঙ্গে কথা না বলে কীভাবে জানা যেতে পারে? টুরিস্ট মেন্টালিটি দিয়ে গ্রামোন্নয়ন হয় না— বলেন রবার্ট চেম্বার্স।

।।৩৭।।

কিউবা মূলত সঙ্কর জাতির দেশ। 'কোথা হতে এলো কত মানুষের ধারা'র মতো সাদা কালো বাদামী সব রঙের মানুষের দেশ কিউবা।' এক প্রাণোচ্ছল জাতি। বলা হয় 'Cuba danced their way to Communism'। আমরা বিমান বন্দরে নেমেই সেটা টের পেয়েছিলাম। মালা অথবা ফুলের স্তবকের বদলে ৫/৭ জন ছেলে মেয়ে নেচে গেয়ে আমাদের স্বাগত জানাল।

'৮৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়া সুপার পাওয়ার বলেই গণ্য হত। রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় এই উদ্যোগ। ফলে তোমাকে রাশিয়ার বন্দনা করেই সব কাজ করতে হবে। যদিও কিউবা রাশিয়ার পথে হেঁটে সাম্যবাদী সরকার গড়েনি। ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারা সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী নিয়ে বাতিস্তার সরকারকে বহিরাক্রমণ করে পতন ঘটিয়েছিল। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলতে যা বোঝায়, কিউবা তার ধারপাশ দিয়েও হাঁটেনি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবার পরেও দেশের ভেতর ব্যক্তিগত মালিকানাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিত্তবান অথচ কাস্ত্রোর সমর্থক, তাদের 'ফ্রেন্ডস্ অব রিভলিউশন' বলে বহাল তবিয়তে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

আমরা ছিলাম হোটেল রিভিয়েরাতে। সমুদ্রের ধারে। সন্ধেবেলা সমুদ্রের ঢেউ কোমর সমান প্রাচীর টপকে রাস্তাকে ধুইয়ে দিয়ে যেত। অপূর্ব অনুভূতি। অনেক কিছুর ভেতরেই পশ্চিমের ছোঁয়া ছিল। রিভিয়েরাতে 'নাইট ক্লাব' অথবা 'কাপাকোবানা' বলে রাতের আকর্ষণের এক রেস্তোরাঁ কাম নাইট ক্লাবের গল্পও যাঁরা যেতেন, তাঁদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যেত। এখানেও আমি 'দুই সদস্যের' দলের নেতা। তাই রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা, ইস্তেহার, কমিটি মিটিং— সব নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। ধীরাজ কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াত জানাও যেত না। কারণ দু'জনকে দুটো আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছিল।

একদিন 'বাইল্যাটারাল টক'-এর জন্য যাওয়া হল কিউবার যুব সংস্থার সদর দপ্তরে। আমার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনোদ খান্নাও ছিলেন। কথায় কথায় জানতে পারলাম, এ দেশে প্রায় সব দেশেরই মানুষ আছে। বিনোদ খান্নার তথ্য অনুযায়ী গন্তানিমো বলে কিউবার একটি জায়গায় দশ হাজার ভারতীয়ও বাস করে। এ দেশে কোনও রেসিয়াল প্রবলেম নেই। নেই কোনও কালার নিয়ে বৈষম্যের বাতাবরণ। ফলে সবাই খুশি, সবাই প্রাণোচ্ছল। তবে ভাষাটা কেবলমাত্র স্প্যানিশ। অন্য কোনও ভাষা বলে পথে ঘাটে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

একদিন রাউল কাস্ত্রোর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ছিল। খুব মজাদার লোক। প্রতি কথায় হাসেন এবং হাসাবার চেষ্টা করেন। কারণ হিসেবে বললেন, আমাদের চিনি ছাড়া কিছু নেই। তাই জীবনটা মিষ্টিতে ভরা। যেমন চীনের 'চীনাম্যান' ছাড়া কিছু নেই, বলেই আবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

আসবার আগে একদিন সন্ধেবেলা ওয়াটার ব্যালে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। কী অপূর্ব দৃশ্য। না দেখলে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। মেয়েগুলো সারা শরীরটাকে জলে ডুবিয়ে শুধু পা দিয়ে জলের ওপর পদ্ম ফুল তৈরি করছে।

আমরা ভারত উপমহাদেশের ডেলিগেটরা নিজেদের ভেতর এক রকম সখ্য গড়ে তুলেছিলাম। আমি, বাংলাদেশের

ইমাজুদ্দিন, শ্রীলঙ্কার আয়ুব— আমরা বেশিরভাগ সময়েই একসাথে কাটাতাম। শুনতে মজা লাগবে, আয়ুব খুব আমার ‘গানের’ একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিল। আসলে ও ভারতীয় হিন্দি গানের খুব ভক্ত ছিল। তাই আমি যাই গাইতাম, ওর ভাল লেগে যেত।

‘নিরস্ত্রীকরণ’ তখন আন্তর্জাতিক আঙিনায় একটা খুব প্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল কারণ, তখন ‘ঠান্ডা যুদ্ধের’ যুগ চলছে আর— এএনসি, সোয়াপো, পিএলও— এরা সব নিজের নিজের দেশে স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে। অর্ধেক দক্ষিণ আমেরিকা মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে চলছে, কারণ চাদ, হুন্ডুরাস, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, বলিভিয়া— প্রায় সব দেশেই মার্কিনি তাঁবেদার সরকার গণতন্ত্রের দরজা বন্ধ করে রেখেছে। তাই কিউবার সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব যুব উৎসবের প্রস্তুতি কমিটির সভা হলেও অনেক আন্তর্জাতিক স্তরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ভাষা যে শুধু কথা বলে না, মানুষের চোখ, তার শরীরী ভঙ্গীও যে বার্তা দিতে পারে তা সম্মেলনের শুরুতেই ভেনেজুয়েলার একটি কিশোরী স্প্যানিশ ভাষায় দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে গাওয়া গানের ভেতর দিয়েই সে বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছিল।

আমাদের কাছে তখন আন্তর্জাতিক স্তরে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় ছিল, ভারত মহাসাগরকে ‘জোন অব পিস’ বলে ঘোষণা করতে হবে। কারণ দিয়াগোগার্সিয়া নামে ছোট একটি দ্বীপে আমেরিকা তার নৌঘাঁটি গড়তে চাইছে, যা হলে আমাদের ঘাড়ের উপর আমেরিকার নিঃশ্বাস পড়বে। তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি হোক, এটাই আমাদের অগ্রাধিকারে ছিল।

আলোচনা যখন শুরু হল, তখন যে তথ্য উঠে এল, তা আরও অনেক বেশি উদ্বেগপূর্ণ। জানা গেল, পৃথিবীতে তখন যে পরিমাণ আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার সঞ্চিত ছিল তার দশ শতাংশও যদি বিস্ফোরিত হয় তবে সারা পৃথিবীতে ছ’মাসের জন্য এক শৈত্যের বাতাবরণ (Nuclear Winter) তৈরি হবে এবং তখন এই ধরণীতে কোনও রোদ পৌঁছাবে না। মানে ছ’মাসের সূর্যগ্রহণ, অর্থাৎ দূষণজনিত কারণে গোটা পৃথিবীর এক অপমৃত্যু। তখন মনে হল, পৃথিবীই যদি না বাঁচে, ভারত মহাসাগরকে ‘জোন অব পিস’ করে কী এগোবে!

অনেকের মনে আছে, সে সময়ে আমেরিকা গ্রানাডায় সেনা পাঠিয়ে অতর্কিতে সে দেশ দখল করে নিয়েছিল। তথ্য প্রযুক্তি তখনও এত উন্নত হয়নি, কিন্তু সেই সময়েই রাশিয়া স্যাটেলাইটে সেই ইনভেশনের ‘ফিল্ম’ তুলে হাভানার সম্মেলনে দেখিয়েছিল।

কিউবা তখনই খুব আধুনিক। মেয়েরা যথেষ্ট সপ্রতিভ এবং মেলামেশায় অত্যন্ত সাবলীল। আমরা যারা ভারত উপমহাদেশের প্রতিনিধি ছিলাম, আমাদের দেখাশোনার ভার মূলতঃ দু’জন মেয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। কারমেন ও মার্লিন। মার্লিন দেখতে ইউরোপীয় আর ‘কারমেন’কে দেখলে যে কেউ ভারতীয় বলবে। কেন জানি না, ও আমাদেরও খুব নিজের ভাবতে শুরু করেছিল। একদিন ইমাজুদ্দিন মজা করে বলল, ‘কারমেন, আই অ্যাম সাফারিং ফ্রম অ্যান এইলমেন্ট।’ ও তো ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘কী হয়েছে? আমাদের এখানে হেল্‌থ কেয়ার খুব ভাল। চলো তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আসি।’ ইমাজুদ্দিন বলল, ‘তোমাদের ডাক্তার আমার রোগ সারাতে পারবে না। পারলে তোমার মা বাবাই একমাত্র সারাতে পারবে।’ ও কোনও ক্লু না পেয়ে বলল, ‘কী বলছো? কী হয়েছে?’ ইমাজুদ্দিন বলল, ‘আই হ্যাভ বিন কারমেনাইজ্‌ড।’ ও তো হেসেই লুটোপুটি। বলল, ‘আমি অলরেডি এনগেজ্‌ড না হলে তোমার রোগ সারাবার চেষ্টা করতাম।’

কোথা থেকে ছ’টা দিন কেটে গেল। দুঃখ নিয়ে ফিরলাম, স্প্যানিশটা জানলে, এই ট্রিপটা অনেক বেশি মিনিংফুল হতে পারত। অনেক বেশি জানবার সুযোগ পেতাম। কারণ ল্যাটিন আমেরিকার ফুটবল যতই আমাদের কাছের মনে হোক, দেশগুলি যেমন দূরে তেমনই আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা রয়ে গিয়েছে। মেক্সিকোর একটি ছেলে রোজ ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ-এ কথা শুরু করত। রোজই বলতে হত, আই স্পিক ইংলিশ। ধূমপানে কেউ কারও চেয়ে কম ছিল না। কী ছেলেরা, কী মেয়েরা। একদিন সকালে আমার টেবিলে কলম্বিয়ার একটি মেয়ে বসেছে। ও ওর দেশের সিগারেট ধরিয়েছে। আমি একটা ক্লাসিক এগিয়ে দিয়ে বললাম, এটা একটু টেনে দেখো, কেমন লাগে। দু’বার টেনে বলছে, ‘ভেরি স্ট্রং, আই ফিল ডিজি।’ তার প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।

ফেরার সময় ওয়েদার খুব খারাপ ছিল। প্লেন বারবার বাম্প করছে। তার ওপর নীচে আটলান্টিক। খানিকটা টেনশন হচ্ছিলই। কিন্তু রাশিয়ানরা বলেছিল SU62 অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিমান। তাই খুব একটা ভয় পাইনি। আর ভয় কাটাতে এর তার সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। আমার পাশেই বসেছিল পোল্যান্ডের ছেলে পল। ও জানতে চাইল, ‘ওয়াজ গ্যান্ডি দ্যাট গ্রেট অ্যাজ আই হ্যাভ সিন হিম ইন অ্যাটনবোরো’স ফিল্ম?’ আমি বললাম, অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। উনি যা ছিলেন, অ্যাটেনবোরো তাই দেখিয়েছে। ও শুধু বলল, ‘আনবিলিবেব্‌ল।’

এবার টানা বাইশ ঘণ্টার বিমান যাত্রা নয়। চোদ্দ ঘণ্টা পরে মস্কো এসে এবার দু’দিন মস্কোতে ব্রেক জার্নি। যাবার সময় মস্কোর তাপমাত্রা ছিল মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি। এবার তাপমাত্রা মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি। হোটেলের বাইরে বেরোনো কঠিন। কিন্তু যেতেই হবে। কারণ, আন্দ্রেপভের দেহ শায়িত আছে। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হবে। এবং ব্রেক জার্নির মূল কারণও তাই। মস্কো হোটেলের রুমগুলোতে উলের কার্পেট পাতা। পুরো হোটেলটা সেন্ট্রালি হিটেড। দ্বিতীয় দিন ধীরাজ আমার ঘরে এসে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, ‘দাদা মেরা আজিব সা বিমারী হো চুকা হ্যায়। ম্যয়, পতা নেহি, ক্যা করুঙ্গা।’ আমি বললাম, কেন কী হয়েছে? ও বলল, ‘মেরা বদন সে বিজলী নিকাল রহি হ্যায়।’ আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, ভয় পেয়ো না। আমারও হচ্ছে। উলের কার্পেটে চলাফেরা করলে শরীরে স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি তৈরি হয়, আর চুল আঁচড়াবার সময়, জামা খুলবার সময় মনে হয়, কারেন্ট মারছে। ওর ধড়ে প্রাণ এল।

।।৩৮।।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আমাকেও সমৃদ্ধ হতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। অনেক বিষয়ে আমার ধারণাকে স্বচ্ছ ও গভীর করতে রসদ জুগিয়েছে, যা পরবর্তীতে দলে রাজনীতিতে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পথ দেখিয়েছে। যে কথাগুলি নতুন শুনেছিলাম বা অজানা ছিল,

আমাদের কাছে তখন আন্তর্জাতিক স্তরে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় ছিল, ভারত মহাসাগরকে ‘জোন অব পিস’ বলে ঘোষণা করতে হবে। কারণ দিয়াগোগার্সিয়া নামে ছোট একটি দ্বীপে আমেরিকা তার নৌঘাঁটি গড়তে চাইছে, যা হলে আমাদের ঘাড়ের উপর আমেরিকার নিঃশ্বাস পড়বে। তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি হোক, এটাই আমাদের অগ্রাধিকারে ছিল।

তার ভেতর তিনটি বিষয় আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যা পঁয়ত্রিশ বছর পরে আজও আমার ভেতর অনুরণিত হয়।

গ্রাম বা গ্রামীণ সমস্যা নিয়ে নিজের চারপাশে যা দেখতাম তার থেকেই ধারণা তৈরি করতাম। দারিদ্র, অনগ্রসরতা নিয়ে আগেও ভাবিনি তা নয়। বরং ভেবেছিলাম বলেই, এই কর্মসূচীকে সফল করতে নিজেকে সমর্পিত করেছিলাম। কিন্তু শিবিরে গ্রাম বিকাশের পথে অন্তরায়গুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গঙ্গরাদে সাহেব একটি তত্ত্বের কথা বলেছিলেন। যদিও সেটি মূলতঃ রবার্ট চেম্বার্স বলে একজন সমাজবিজ্ঞানীর লেখা। তাঁর কথায় ভারতবর্ষের দারিদ্র লুক্কায়িত (hidden poverty) হয়ে আছে। তাকে দেখতে হলে আগে তাকে খুঁজতে হবে। এবং না খুঁজলে কতগুলি ঝোঁকের (biases) কারণে সে 'না দেখা'ই থেকে যাবে।

রবার্ট চেম্বার্স বলেছেন, গ্রামোন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হল 'Rural Development Tourism'। অর্থাৎ tourist mentality নিয়ে উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীরা জানেন না যে, তাঁদের গাড়ি যে পর্যন্ত যায় দারিদ্র তার চেয়ে দূরে থাকে। তাকে দেখতে হলে পায়ে হাঁটা পথে চলতে হয় অনেকটাই, যা তাঁদের রুচিতে নেই।

তাঁরা যান গ্রামে, যখন বর্ষা নেই, রাস্তায় কাদা নেই, গাড়ি আটকে যাওয়ার ভয় নেই, বাড়ি ফেরবার কোনও অসুবিধা নেই। অর্থাৎ মানুষ যখন অসুবিধায় থাকে তখন তাঁদের যেতে নেই। তাঁরা যান প্রজেক্ট দেখতে, স্কুল দেখেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখেন, প্রজেক্ট কর্মীদের মাইনে কম নিয়ে দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করেন, স্কুলের শিশুদের অপুষ্টি নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন, ওষুধের অপ্রতুলতা নিয়ে অভিযোগ করেন, কিন্তু যে মানুষটি কম মজুরিতেও কাজ করতে রাজি আছে কিন্তু প্রজেক্ট-এ তার জায়গা হয়নি বলে বেকার জীবনযাপন করছে, যে শিশুটি অপুষ্টির সাথে সাথে বস্ত্রহীন বলে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে আসতে পারেনি, যে রোগীটি সঙ্গতির অভাবে হাসপাতালের বারান্দা পর্যন্ত আসতে পারেনি, তাদের সঙ্গে কারও দেখা হল না।

তাঁরা যখন খোঁজ নেন, জানতে চান, সমীক্ষা করেন, খোঁজেন তাদের যারা সমীক্ষাপত্রের প্রশ্নাবলী বুঝতে সময় নেবে না। সেই শহরে শিক্ষিত, কলেজে পড়া, গ্রামের বিত্তশালী মানুষটি সমীক্ষার প্রশ্নাবলী বুঝতে হয়ত সময় নেবে না, কিন্তু দারিদ্র বুঝতে সময় নেবে। কারণ, সে তার জীবন দিয়ে দারিদ্র কী তা কখনও অনুভব করেনি।

তাঁরা যান পুরুষ শাসিত সমাজে, পুরুষদের কাছ থেকে খবর নেন, জানতে চান বাস্তব ছবিটি কী। কিন্তু বাস্তব জীবনে ৫টি সন্তানকে নিয়ে যে জনমজুরের বউ সাতটি মানুষের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করছে তার ঘোমটার তলায় চোখের কোলে যে জল জমে আছে তা কেউ দেখতে পেল না।

তাই টুরিস্টদের 'ট্যুর' হল, সরকারের তেল পুড়ল, টিএ/ডিএ বিল হল, কিন্তু দারিদ্রের সাথে দেখা হল না। তাই রবার্ট চেম্বার্স বলেছেন ভারতবর্ষের দারিদ্র আসলে hidden poverty তার দূরীকরণের আগে তাকে খোঁজাটাই প্রাথমিক কাজ।

আর একটি বিষয় ছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস। অসাধারণ বলতেন জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রশিদউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলতেন, আমরা অনেক সময় ধার্মিক ও ধর্মান্ধতার ভেতর তারতম্য করতে পারি না। যে রোজ মন্দিরে যায়, সে ধার্মিক, সে ধর্মান্ধ নয়, যে রোজ মসজিদে যায়, সে ধার্মিক, সে ধর্মান্ধ নয়, যে রোজ গুরুদ্বারা যায়, সে ধার্মিক, সে ধর্মান্ধ নয়, এবং যে প্রতি রবিবার গীর্জায় যায় সেও ধার্মিক, ধর্মান্ধ নয়। আকবর ধার্মিক ছিলেন, ধর্মান্ধ ছিলেন না। ঔরংজেব ধর্মান্ধ ছিলেন, ধার্মিক ছিলেন না। সম্রাট অশোক ধার্মিক ছিলেন, ধর্মান্ধ ছিলেন না। গান্ধীজী ধার্মিক ছিলেন, ধর্মান্ধ ছিলেন না। ভিন্দ্রনওয়ালে ধর্মান্ধ ছিলেন, ধার্মিক ছিলেন না। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হতে গিয়ে ধর্মহীন হয়ে গিয়েছি, তার ফলে ধর্মান্ধরা ধার্মিক সেজে দেশের সাম্প্রদায়িক বাতাবরণকে কলুষিত করছে।

যখন বলতেন, দেশ বিভাজনের পর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাকিস্তানমুখী মুসলমানদের আবেদন করে বলতেন, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা? দেখছো না জামা মসজিদ তোমায় ডাকছে, তাজমহল তোমায় ডাকছে, হুমায়ুনের সমাধি তোমায় ডাকছে?' গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। মাঝে মাঝে ক্লাস নিতে ডাকা হত জেএনইউ-এর উপাচার্য্য মুনীশ রাজাকে। তিনি বলতেন, ছোটবেলায় পাঠশালায় পড়েছি, মন্দির ভগবানের হয়, আর মসজিদ খোদার হয়। দিল্লি এসে শুনলাম, মন্দির নাকি বিড়লারও হয়, আর মসজিদ নাকি বাবরেরও হয়। যে মন্দির বিড়লার হয়, তাতে ভগবান থাকতে পারে না। আর যে মসজিদ বাবরের হয়, তাতে খোদা থাকতে পারে না। তিনি আরও বলতেন, রাম কেমন ভগবান যে একটা মন্দির না হলে ভগবান থাকতে পারে না, আর খোদা কেমন আল্লাহ্‌তালা যে একটা মসজিদ না হলে খোদা থাকতে পারে না?

রশিদউদ্দিন আহমেদ, মুনীশ রাজারা ধর্মনিরপেক্ষতার যে বার্তা শিবিরগুলিকে দিতেন তার ফলশ্রুতিতে যারা এক সময় এই কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, তারা আজ কেউ পদে আছে, কেউ বিপদে আছে, কিন্তু কেউ কোনও সাম্প্রদায়িক ভাবনার সাথে নিজেকে যুক্ত করেনি।

আমরা যে পাঠ দিতাম তা শুধু যে শিখছে তার চেতনার উন্মেষ হওয়াটাই শেষ কথা নয়, তাকে সেই অর্জিত জ্ঞান ও শিক্ষা কীভাবে অন্যকে বোঝাতে হবে তার জন্য তার 'কম্যুনিকেশন স্কিল' বাড়ানোর চেষ্টা হত, সেটাও এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। এরিক বার্নের I am OK, you are OK পড়ানো হত, তার সঙ্গে 'behavioural science'। তাতে stroke ছিল খুব আকর্ষণীয় বিষয়। positive stroke, negative stroke, conditional positive stroke, conditional and unconditional negative stroke — অনেক নতুন বিষয় জানবার অবকাশ হয়েছিল। হয়ত আজ আমি, যে সামান্য হলেও জনজীবনে

রেখাপাত করতে পেরেছি, তার জন্য এ সমস্ত শিক্ষাই আমাকে রসদ জুগিয়েছে।

আজ আত্মরোমন্থন করতে গিয়ে অনেক বিষয় নিয়ে সমালোচনার দৃষ্টিতে নিজের ভূমিকার কথাও ভাবি। আমারও কি সব সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল! আমি ছেলেদের জন্য অন্ধের মতো লড়াই করে গিয়েছি। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে চাইতাম না। আমার মনে হত, ওরা একটা তপস্যায় ব্রতী হয়েছে। যাদের কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়ছে, তারাই কেবল ওদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছে।

প্রতিটি রাজ্যে 'ওয়ার্কশপ' হত। রাজ্যের চিফ সেক্রেটারির উপস্থিতিতে ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের অগ্রগতি নিয়ে ছেলেরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানাত। কিছু কিছু তথ্য প্রশাসনও শুনে তাজ্জব হয়ে যেত। এতো গভীরে এরা যাচ্ছে— এ তো জানা ছিল না। IRDP-তে লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রতি ব্লকে প্রতি বছর ৬০০ করে দরিদ্রতম পরিবারকে গরিবী রেখার উপরে তুলতে হবে। তাদের ২৫ শতাংশ অনুদান সরকার দেবে আর ৭৫ শতাংশ ব্যাঙ্ক দেবে। কিন্তু ছেলেরা প্রথম জানাল, রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের পাঠানো তালিকা ব্যাঙ্ক নিচ্ছে বটে, কিন্তু দিচ্ছে না। তার কারণ, ওদের অনাদায়ী ঋণ আছে। ছেলেরা বলত দরিদ্রতম ব্যক্তিটির অনাদায়ী ঋণ আছে বলেই তো ও দরিদ্রতম। ব্যাঙ্ক ওকে ফেরাচ্ছে বলে, ২৫ শতাংশ সাবসিডিও ওরা পাচ্ছে না। এর প্রতিকার কী! মুখ্য সচিবরাও মাথা চুলকাতে শুরু করতেন। ৬০০ বেনিফিসিয়ারির ভেতর ৪০০ বেনিফিসিয়ারিকে প্রাইমারি সেক্টর ও বাকি ২০০ বেনিফিসিয়ারিকে টারসিয়ারি সেক্টরে লোন দেওয়ার কথা। কিন্তু সবাইকে কেবল কেন মোষ কেনানো হচ্ছে? যাদের সামনে এই তথ্যগুলি দেওয়া হত— তাদের চোখমুখ দেখে মনে হত এ ধরনের feedback ওঁরা প্রথম পাচ্ছেন। এনআরআইপি-তে ঠিকাদার নিয়োগ করা যাবে না— বলা থাকলেও ঠিকাদারদের নিয়েই প্রায় সর্বত্র কাজ চালানো হত।

ওরা রিপোর্ট পাঠাত। আমরা প্রসেস করে প্ল্যানিং কমিশনে আর পিএমও-কে পাঠাতাম। পরে অর্জুন সেনগুপ্ত (তদানীন্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি) আমায় বলেছিলেন, ইন্দিরাজী নিজে এই রিপোর্টগুলি দেখতে চাইতেন।

একদিন প্ল্যানিং কমিশন থেকে ডাক এল। বিশেষজ্ঞদের সামনে প্রেজেন্টশন করতে হবে। তার ফলশ্রুতিতে দেবুদা (ডি বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার কাজের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তখন তিনি ছিলেন প্ল্যানিং কমিশনের সচিব।

পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। আজও

দেশ বিভাজনের পর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাকিস্তানমুখী মুসলমানদের আবেদন করে বলতেন, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা? দেখছো না জামা মসজিদ তোমায় ডাকছে, তাজমহল তোমায় ডাকছে, হুমায়ুনের সমাধি তোমায় ডাকছে?' গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ছেলেরা (এখন ওদের ছেলেরাও বড়) আগের মতোই মনের টান অনুভব করে। কয়েকদিন আগে রমেশ চৌকসের ছেলের বিয়েতে ভূপাল যেতে হয়েছিল। Stage four cancer patient। ফোন করে বলল, 'দাদা, এটাই বোধহয় আমার শেষ কাজ। আপনাকে আসতেই হবে।' হাওড়া থেকে বম্বে মেল ধরলাম। শীতের দিন। ট্রেন পাঁচ ঘণ্টা লেট। জব্বলপুর পৌঁছাল বিকেল ৫-৩০-এর বদলে রাত ৯-৩০-এ। সুধাকর গৌড় রাতের খাবার নিয়ে উঠে এল। রাত ১১-৩০-এ নরসিংপুর স্টেশনে, বালাপ্রসাদ বাড়ি থেকে গরম কফি ফ্লাস্কে করে নিয়ে এসেছে। ট্রেন ইটারসি পৌঁছাল রাত ১টা ৩০-এ। কপিল ফৌজদার 'বোলেরো' নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভোর ৪টেয় ভূপাল পৌঁছালাম। অতিথিরা কেউ নেই, শুধু বাড়ির লোক আর বিয়ের অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব— ফেরা চলছে। আধ ঘণ্টা বসে এক কাপ গরম লিকার 'চা' খেয়ে আবার ইটারসি। চৌকসে বলল, শুধু আপনার জন্য 'নন ভেজ' আনানো আছে, নিয়ে যেতে হবে, এখন খেতে বলব না।

সাড়ে চারটায় বেরিয়ে সাড়ে ছ'টায় আবার ইটারসি। এসি রিটায়ারিং রুম বুক করা ছিল। চান করে, প্রাতঃকৃত্য সেরে উঠতে উঠতে আটটা। কাকো ভাই বাড়ি থেকে নাস্তা নিয়ে এসেছে। এক পেট খেয়ে ৯-৩০-এ ফিরতি বম্বে মেল। সঙ্গে জব্বলপুর পর্যন্ত সুধাকর। প্যান্ট্রিতে গরম করে মনের সুখে চৌকসের দেওয়া 'নন ভেজ' খেতে খেতে ফিরে এলাম। এখন প্রায় সত্তর ছুঁয়েছি। পুরো রাত সফর করে কাটিয়ে দিলাম। ছেলেদের ভালবাসার উত্তাপ কোনও ক্লান্তি বুঝতে দিল না।

(ক্রমশ)

লঙ্কাপাড়া চা-বাগানের একশ্রেণির শ্রমিকরাই চায় না বাগান খুলুক, নির্বিচারে চলছে গাছকাটা

ডানকানদের বাগান পরিচর্যায় অবহেলার পরিণতি উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি ও আজকের সংকট!

অধিগ্রহণের নীতিতে ডানকানস সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটলেও কোনও শিল্পের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব তাদের ছিল না। চা-বাগানগুলির উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য পুরনো গাছ তুলে নতুন গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া ডানকানদের বাগনগুলিতে হয়নি বললেই চলে। ৬২ শতাংশর বেশি বাগান এলাকা সেচ ব্যবস্থার আওতায় আসেনি, প্রায় ৪২ শতাংশ এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতই উৎপাদনের ঘাটতি ক্রমশ তীব্র হতে থাকে এবং তার ফলে নগদ পুঁজির সংকট। তার প্রমাণ চা-শিল্পে মন্দার সময়ও টাটা, গুডরিক, অ্যান্ড্রু ইউল অনেক ভাল ফল করেছে। কিন্তু অন্য দিকে নিলামের বাজারে চায়ের দাম খুচরো বাজারের চাইতে অনেক কম রেখে মুনাফা বাড়িয়েছে এইসব বড় বড় কোম্পানিগুলি। চা-বাগানের সংকট আসলে কোম্পানিগুলির আর্থিক দুরাচার এবং শঠতাপূর্ণ পরিচালনব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম। চা-শিল্পের ওঠা-নামাকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। **ভীষ্মলোচন শর্মার** নিয়মিত ক্ষেত্র সীমাক্ষার ২১তম পর্বে ধরা পড়েছে সেই সব সত্য।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ে এই সে দিনও ডানকানস একটি বনেদি কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাগানের সংখ্যা, বাগানগুলির আবাদি এলাকা, উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদনের পরিমাণ—সব দিক দিয়েই ডানকানস ছিল প্রথম সারিতে। শ্রমিকদের দেনাপাওনাও তুলনামূলকভাবে মন্দ ছিল না। সেই বাগানগুলিতে এইরকম অবস্থা চায়ের রমরমা বাজারে একেবারেই অবিশ্বাস্য।

দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতে বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই যাচ্ছে নদীতে পাথর ভাঙতে, অন্য বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ করতে অথবা শহরে রাজমিস্ত্রির জোগানের কাজে, সেইসব কাজও সবসময় পাওয়া যায় না। মরশুম এসে যাওয়ায় অন্য বাগানের কাজও এখন আর নেই। কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে অনেকেই। সেখানেও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে অনেকেই, বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা, নারী পাচার, মানব পাচারের চক্র সক্রিয়। বন্ধ বাগানগুলিতে জাঁকিয়ে বসেছে অনাহার এবং অর্ধাহার।

শ্রমিকদের আশু এবং দীর্ঘকালীন লড়াইয়ে পাশে থাকার

তাগিদ থেকেই একদল সমাজকর্মী ডানকানসের বাগানগুলিতে সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষা চালান সরকারপক্ষের শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিরা, সমীক্ষা চালান বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকেও ভীষ্মলোচন শর্মার কলামে তুলে আনা হয় অজানা কিছু তথ্য। তাই তথ্যভাণ্ডার জোগাড় করা এবং আমাদের মূল্যায়ন অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করার প্রয়োজনে নিজেদের সমৃদ্ধ করার অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলনই এই প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে। নির্ভীক এবং নিরপেক্ষভাবে তথ্য তুলে এনে ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার নির্যাস তুলে ধরা হল পাঠকবর্গের সামনে। চা-বাগান সংগ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের লড়াইকে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াস নেওয়া হয়। এই প্রয়াসে শামিল হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক তামসরঞ্জন মজুমদার এবং তাঁর সতীর্থরা। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে পৌঁছে গেলাম তাঁদের কাছে। পেলাম চা শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনার নগ্ন চিত্র।

ভারতীয় কর্পোরেট হাউসগুলির বাণিজ্যভাবনা এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, কর্পোরেট জগতে গোয়েঙ্কা পরিবারের বিশেষত্ব হল, তারা অন্য কোম্পানি কিনে নেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির দিকে মূল গুরুত্ব দেয়। গোয়েঙ্কারা বিশ্বাস করে, সাফল্যের সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসা কিনে নেওয়া বা অধিগ্রহণ করলেই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি আসে আর প্রতিযোগীদের হটিয়ে দেওয়া যায়। এই অধিগ্রহণের সংখ্যা প্রচুর এবং বিবিধ প্রকার ও বহুমুখী ব্যবসা নিয়ে এই রাজত্ব। তাই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে কর্পোরেট তালিকায় অন্যান্যদের পিছনে ফেলে গোয়েঙ্কারা তিন নম্বরে উঠে আসে। মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে যে গতিতে তারা বেড়ে ওঠে, টাটা-বিড়লার পক্ষেও তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন ছিল। বাণিজ্যজগতে অন্য কোম্পানি কিনে ফুলেফেঁপে ওঠার অন্য নামই হল গোয়েঙ্কা। বাণিজ্যজগতে 'অধিগ্রহণ জাদু' বজায় রাখার জন্যই দ্রুত রিটার্নের আশায় 'ডিল' এক ব্যবসা থেকে উপার্জিত পুঁজি বিনিয়োগ করে অন্য ব্যবসাতে। কোথাকার অর্থ কোথায় গেল, তাতে কোনও শিল্প ধ্বংস হল কি না, দেউলিয়া হল কি না— এসব যেন কোনও ব্যাপারই না 'ডিল' অর্থাৎ ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কাছে।

ইদানীংকালে ডানকানস-সহ উত্তরবঙ্গের পুরনো বাগানগুলিতে সাধারণভাবে চা গাছগুলির বেশি বয়স হবার ফলে উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। গাছের বয়স যত বাড়ছে, তার উৎপাদন ক্ষমতাও তত কমছে। ফলে সামগ্রিক উৎপাদনেরও একটা প্রভাব পড়ছে। বেশি বয়সের চা গাছের ক্ষেত্রে চা-পাতার গুণগতমানও নষ্ট হয়। ফলে বাগানগুলিতে এখন উৎপাদন ঘাটতি এবং গুণগতমানে ঘাটতি— এই দ্বিমুখী আক্রমণ দেখা দিচ্ছে। সংগ্রাম সমিতি যে সমীক্ষা করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ডানকানসের সব বাগানেই ৫০ বা তার চেয়েও বেশি বয়সি চা গাছের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। পুরনো গাছ তুলে নতুন গাছ লাগানোর প্রক্রিয়াটি এই বাগানগুলিতে হয়নি বললেই চলে। উল্লেখ করা যেতে পারে, টি বোর্ড অব ইন্ডিয়া ২০০৭ সালে 'স্পেশ্যাল পারপাস টি ফান্ড স্কিম' শুরু করে। তাতে বলা হয়, উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি বাগানেই নিয়মমাফিক 'রিপ্ল্যান্টেশন' করার কথা। এই কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বাগানগুলি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে ঋণ পায় এবং টি বোর্ড থেকে বিশেষ অনুদানও পায়। তাই বলা যায়, অনুকূল ব্যবস্থা সত্ত্বেও ডানকানস ম্যানেজমেন্ট এই কাজগুলো যথাযথ গতিতে করার ব্যাপারে চরম উদাসীন ছিল। বছরে অন্তত ২ শতাংশ উৎপাদক এলাকায় রিপ্ল্যান্টেশন করার কথা। কিন্তু সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়েও ডানকানস ম্যানেজমেন্ট এই কাজকে ভীষণ অবহেলা করেছে।

চা বাগিচা ডুয়ার্স ও তরাই	**উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)**		**উৎপাদনশীলতা হ্রাসের শতকরা হিসাব**
	১৯৯৮-৯৯	২০১১-১২	
বীরপাড়া	২২৭৫	১৭৪৭	২৩.২১
হান্টাপাড়া	২৬৩৮	১৭০০	৩৫.৫৬
ধুমসিপাড়া	২৮৪৩	২০১৬	২৯.৯০
লংকাপাড়া	২৪৩৬	১৩৫৯	৪৪.২১
তুলসীপাড়া	১৯৬১	১৩০০	৩৩.৭১
গ্যারগান্ডা	২৭৮১	১৬০০	৪২.৪৭
কিলকট	২৬৩৬	১৬৯৭	৩৫.৬২
নাগেশ্বরী	২৮১০	১১৩৫	৫৯.৬১
বাগরাকোট	২৮৮৯	১৯৬৮	৩১.৮৮
গঙ্গারাম	৩১৯৬	২৬২০	১৮.০২

তথ্য সহযোগিতা- চা-বাগান সংগ্রাম সমিতি সার্ভে অব টি গার্ডেন ২০১৩-১৪

উপরের তথ্যসূত্র স্পষ্টতই প্রমাণ করে, বাগানগুলিতে নিরপেক্ষভাবেই উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি এসেছে। প্রায় ৫০ শতাংশ বাগানে উৎপাদন হ্রাস ৩৫ শতাংশ বা তার বেশি। ৩৪ শতাংশ বাগানে এই হ্রাসের পরিমাণ ২০ শতাংশ বা তার বেশি এবং বাকি ১৫ শতাংশের ক্ষেত্রে এই হার শতকরা ১০ শতাংশ বা তার বেশি। তরাই এবং ডুয়ার্সের বাগানগুলিতে উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৩৪.২৭ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ সালে তুলসীপাড়া ছাড়া ডানকানসের অন্যান্য চা-বাগানে উৎপাদনশীলতা যথেষ্টই ছিল। অথচ ২০১১-১২-তে এসে ধাপে ধাপে বাগানগুলির উৎপাদনশীলতা কমে যেতে লাগল। এর মূল কারণ হল 'আপরুটিং', 'রিপ্ল্যান্টেশন' এবং 'রিজুভিনেশন'-এর অভাব। ডানকানসের বাগানগুলি প্রত্যাশার ধারেকাছেও নেই। সেচ এবং নিকাশি ব্যবস্থাও চা গাছের থেকে ভাল উৎপাদন পাবার জন্য জরুরি। ডানকানসের বাগানগুলি এদিক দিয়েও ব্যর্থ।

চা-বাগান সংগ্রাম সমিতির সমীক্ষায় প্রকাশ, ৬২ শতাংশের বেশি বাগান এলাকা সেচব্যবস্থার অধীনেই আসেনি। প্রায় ৪২ শতাংশ এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা নেই। সমীক্ষা চলাকালীন চা শ্রমিকরা জানিয়েছেন, ২০০০ সালের পর থেকে বাগানগুলিতে সারের ব্যবহার প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। তাই ডানকানসের বাগানগুলিতে উৎপাদনের ব্যাপক ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ আপরুটিং, সেচ, নিকাশি ইত্যাদির মতো জরুরি সহায়ক ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার গাফিলতি তো স্পষ্ট। তাই অধ্যাপক তামসরঞ্জন মজুমদারের মতে এটা সহজেই বোঝা যায়, চা গাছের উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হল কোম্পানির হাতে নগদ পুঁজির সংকট। এই সংকট তৈরি হয়েছে চা-শিল্পের অর্জিত অর্থ সার এবং অন্য ব্যবসাতে খাটিয়ে গোয়েঙ্কাদের স্বভাবসিদ্ধ চটজলদি মুনাফা লোফার অসাধু প্রয়াসে। সেসব ব্যবসাতে লোকসানের কারণেই বাগিচাগুলির উৎপাদনে সমস্যার সৃষ্টি।

বাগিচাগুলিকে যথাযথ আর্থিক সহায়তা দিতে পারেনি কোম্পানি অর্থাৎ এই বাগান পরিচর্যায় অবহেলা আর তার পরিণতিতে উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি ডানকানসের অসাধু ব্যবসায়িক নীতির জঘন্য পরিণাম। 'ডিল'-এর বাগানগুলি ছাড়া টাকা, গুডরিক, জয়শ্রী, অ্যান্ড্রু ইউল কিন্তু এই সময়কালে যথেষ্টই লাভ করেছে। তারাও আয় এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সদর্থক, কিন্তু এই সময়কালে কেবলমাত্র আয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নিম্নগতিতে নেমে এসেছে।

২০০২-০৩-এর অর্থনৈতিক মন্দা কি ডানকানসের বাগানগুলিকে একেবারেই শুইয়ে দিয়েছিল?

প্রশ্নের জবাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক তামসরঞ্জন মজুমদার মনে করেন, একেবারেই নয়। তাঁর যুক্তি, ২০০৩-০৭ পর্যন্ত মন্দার ভয়ংকর সময়েও 'ডিল' ছাড়া অন্য কোম্পানিগুলি আয় এবং বিক্রিতে ভাল বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। বৃদ্ধির হার সমান নয়। তবুও সদর্থক। টাটা যদি বিক্রি এবং আয় উভয় ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি ঘটায়, গুডরিক বা জয়শ্রী যদি আয় ও বিক্রির ক্ষেত্রে সদর্থক হয় তাহলে এই সময়কালে কেবলমাত্র ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডই বিক্রি এবং আয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নিম্নগতি লাভ করেছে কেন? যেহেতু 'ডিল' একটি আমব্রেলা কোম্পানি এবং তার অধীনে বহু বিচিত্র সংস্থা রয়েছে তাই এদের ক্ষতি চা-শিল্প ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্র থেকেও হতে পারে। মন্দার সময়কালে ঘরোয়া বাজারে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিক্রির বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ২-৩ শতাংশ। অর্থাৎ চা কোম্পানিগুলি ২০০০-এর গোড়ায় রপ্তানি হ্রাস ভালভাবেই সামলে নিতে পেরেছে ঘরোয়া বাজারের বৃদ্ধির কল্যাণে। বিক্রি এবং আয়ের বৃদ্ধি কোম্পানিগুলির মুনাফাকেও নিশ্চিতভাবেই বাড়তে সাহায্য করেছে। কিন্তু ২০০৪ থেকে ২০০৭ সময়কালে একমাত্র যে কোম্পানিটির আর্থিক স্টেটমেন্ট প্রতি বছরেই ক্ষতি দেখাচ্ছে তা হল ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। চা-শিল্পের ধর্মই হল, এই শিল্প এগয় ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে। কোনও সময়কালে ব্যবসা নিম্নমুখী হলে পরবর্তী সময়কালে তা ঊর্ধ্বগামী হবে। তাই ডানকানসের আর্থিক খতিয়ান বাকি কোম্পানিগুলির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। সামগ্রিক মন্দা বাকিদের উপর খুব একটা প্রভাব ফেলেনি। অর্থাৎ চা-শিল্পের তথাকথিত মন্দা সার্বিকভাবে সমস্ত কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে— এটা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। ডানকানসের লোকসান আর মন্দাকে এক করে দেখা তাই ঠিক নয়।

ভারতে চায়ের নিলামমূল্যের প্রবণতা

সাল	মূল্য (কেজি/টাকা)	বৃদ্ধির সূচক
১৯৯৮	৬৯.৫০	১০০.০০
১৯৯৯	৬৫.৫৫	৯৪.৩১
২০০০	৬১.৭১	৮৮.৭৯
২০০১	৬১.৬৬	৮৮.৭১
২০০২	৫৫.৯৬	৮০.৫১
২০০৩	৫৬.২৭	৮০.৯৬
২০০৪	৬৪.৫৪	৯২.৮৬
২০০৫	৫৮.০৫	৮৩.৫২
২০০৬	৬৬.০১	৯৪.৯৭
২০০৭	৬৭.৪০	৯৬.৪৬
২০০৮	৮৬.৯৯	১২৫.১৬
২০০৯	১০৫.৫৫	১৫১.৯৪
২০১০	১০৩.৫৫	১৪৮.১৯

ভারতের চা-শিল্পে চায়ের বিক্রয়মূল্য বিভিন্ন চা-নিলামকেন্দ্রে প্রাপ্ত দামকে ভিত্তি করেই ধরা হয়। নিলামকেন্দ্রে প্রাপ্ত দামকে সরবরাহ মূল্য বা উৎপাদকের মূল্য বলা যেতে পারে। খুচরো বাজারে চায়ের দামের কোনও হিসেব এই গণনার মধ্যে আসে না। টি বোর্ড বা ওই জাতীয় কোনও সংস্থা থেকে এই ব্যাপারে কোনও সুসংহত তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে ভারতে চায়ের মূল্য প্রবণতা বিশ্লেষণে এটা একটা সীমাবদ্ধতা বলা যেতে পারে। বাগান থেকে সরাসরি কতটা চা বিক্রি হয়, তার হিসেবও ঠিকমতো পাওয়া যায় না। অথচ এই বিক্রির পরিমাণও মোট বিক্রির নিরিখে নেহাত কম নয়। তাই আমরা মূল্য প্রবণতাকে একপেশেভাবে দেখতে বাধ্য হই। একেই হাতিয়ার বানিয়ে লাভক্ষতির অঙ্ক দেখিয়ে চা-শিল্পের মালিকরা বেতন নির্ধারণের সময় নানারকম খেলা খেলে। যদি নিলামমূল্যকে উৎপাদকের সরবরাহমূল্য হিসাবে ধরা হয় তাহলে নিলামমূল্য ওঠানামার জন্য উৎপাদন এবং বিক্রির উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ার কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই দাম পড়ে যাওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও কমছে না বা দেশের বাজারে বিক্রির পরিমাণও কমছে না। টি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, চা-শিল্পের এই সংকটের সময়েও উৎপাদন ও বিক্রি দুইই ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে, অর্থাৎ নিলামে কী দর উঠল, তার উপর উৎপাদন ও বিক্রি কোনওটাই নির্ভর করে না।

বর্তমান নিলামব্যবস্থা চায়ের বিপণনের একমাত্র উপায় নয়। বিকল্প উপায় হল সরাসরি কারখানা বা বাগান থেকে বিক্রি, যাকে বলা হয় এক্স ফ্যাক্টরি বা এক্স গার্ডেন সেল। আর্থিক উদারীকরণের আনুকূল্যে নয়ের দশক থেকে নিলামব্যবস্থা চায়ের ক্ষেত্রে কার্যত প্রাথমিক বিপণনের একটা অবশিষ্ট উপায় হিসাবে টিকে আছে। নিলামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ চা বিক্রি করতেই হবে, এখন আর সেরকম বাধ্যবাধকতা একেবারেই নেই। এরকম অভিযোগও আছে যে, যতটুকু চা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি হয়, তার বেশির ভাগই অত্যন্ত নিম্নমানের চা, যেটি সরাসরি বিক্রি হওয়ার যোগ্যই নয়। কী পরিমাণ চা কী দামে সরাসরি বাগান থেকে বিক্রি হচ্ছে তা প্রকাশ্যে আনার দায় টি বোর্ডেরও নেই, কেনাবেচার কারবারিদেরও নেই। ফলে এটা বোঝা কঠিন নয় যে, নিলামে পাওয়া দামের চেয়ে সরাসরি বিক্রিতে পাওয়া দাম এতটাই বেশি যে, মালিকদের স্বার্থে সেটা গোপন রাখাই একান্ত প্রয়োজন। এমনিতে বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি বিক্রির হিসাব চা নিলামকেন্দ্রের মাধ্যমে মালিকদের জমা দেবার কথা। কিন্তু এই লেনদেনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো তথা উপযুক্ত

কাজ শুরু পরিকাঠামোহীন হান্টাপাড়া চা-বাগানে

নজরদারির কোনও ব্যবস্থা না থাকার ফলে কখনওই ওই নিয়মকে ঠিকমতো মেনে চলা হয় না। ফলে দেখা যায়, টি বোর্ড পর্যন্ত এক্স গার্ডেন সেলের পরিমাণ ও দাম সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নয়। এরকম একটা অবস্থায় সত্যি সত্যিই চায়ের দাম কীরকম যাচ্ছে, সেটা বোঝার জন্য নিলামে ওঠা দামের ভিত্তিতে এক্স গার্ডেন সেল থেকে পাওয়া দামকে অনুমান করাটা একেবারেই যুক্তিযুক্ত হবে না। যদিও নিলামে ওঠা কম দামকে হাতিয়ার বানিয়ে মালিকরা কম মজুরি দেওয়ার এবং ফ্রিঞ্জ বেনিফিটও কেটে নেবার চেষ্টা করে থাকে।

কখনও কখনও নিলামের দামে সামান্য নিম্নগামী প্রবণতা দেখা গেলেও খুচরো বাজারে চায়ের দাম কিন্তু লাগাতারভাবে বেড়েই চলেছে। এমনকি তথাকথিত সংকটের দিনগুলিতেও যখন নিলামে গড়ে ৫০ টাকা প্রতি কেজির মতো দাম পাওয়া যাচ্ছে, তখন খুচরো বাজারে গ্রাহককে চা কিনতে হচ্ছে ১২০ টাকা বা তারও বেশি দামে। নিলাম এবং খুচরো বাজারের মধ্যে চায়ের দামের এই ব্যবধান আর কমেনি। বরং এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান একটা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। এই সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া গতিবেগ অর্জন করার ফলে নিলামে চায়ের দামে কারচুপি করার সুযোগ আগের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন বেশ কয়েকটি চা উৎপাদক কোম্পানি বাগান চালানো, ম্যানুফ্যাকচারিং, নিলাম, সরাসরি বিক্রি থেকে শুরু করে অন্য মালিকদের থেকে ক্রয়, ব্লেন্ডিং, প্যাকেজিং দেশের খুচরো বাজারে বিপণন, বিদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ডানকানস, গুডরিক, টাকা, জয়শ্রী টি, এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ এই ধরনের কয়েকটি কোম্পানি। যেহেতু দেশীয় বাজারের একটা বড় অংশে সাধারণ মানের তথা অপেক্ষাকৃত সস্তা সিটিসি চায়ের প্যাকেটেরই চাহিদা তাই ব্লেন্ডিং ও প্যাকেজিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় চা সংগ্রহ করতে হয় অকশন মার্কেট বা নিলামের বাজার থেকেই। তাই নিলামে দর যতই কমিয়ে রাখা যাবে, তত বেশি ব্লেন্ডিং, প্যাকেজিং এবং খুচরো বাজারে বিপণনে অংশগ্রহণকারী কোম্পানি লাভ ঘরে তুলতে পারবে। নিলামের সময় সেই লোভেই নিজেদের মধ্যে গোপন আঁতাত বা একচেটিয়া জোট গঠনের মতো অসৎ উপায় অবলম্বন করে বড় কোম্পানিগুলি।

বড় বড় বহুজাতিক চা কোম্পানি এই একচেটিয়া জোট গঠনের মাধ্যমে অসৎ উপায় অবলম্বন করে চেষ্টা চালিয়ে যায়, যাতে দাম উপরে উঠতে না পারে। বাস্তবে এই ধরনের অসাধু কাজ দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এটা নিলামপদ্ধতিকে

তুলসীপাড়া চা-বাগানে কাজ শুরু করতে দেয়নি কিছু দুষ্কৃতি। গাছ চুরি, পাতা চুরি করেছে একদল শ্রমিক

অনেকাংশেই দুর্বল করে দিয়েছে। অথচ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চায়ের কেনাবেচা ব্যবস্থার মধ্যে থেকে চায়ের যথাযথ দাম নির্ধারণের জন্যই তো নিলামব্যবস্থা। বড় কোম্পানিগুলির নীতিভ্রষ্ট কারবারের একটা প্রমাণ পাওয়া যায় আইএলও-র রিপোর্টে, যেখানে দেখানো হয়েছে, খুচরো বাজারে বড় চা ব্যবসায়ীরা নিলামে দাম পড়ে যাওয়া এবং খুচরো বাজারে চায়ের দাম বৃদ্ধি পাবার ফলে কীভাবে লাভবান হচ্ছে। টি বোর্ড পরিচালিত সমীক্ষার থেকে জানা যায়, কীভাবে বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং অন্য বড় কারবারিরা তাদের প্রভাবকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে চায়ের উচিত মূল্য নিরূপণে বাধা সৃষ্টি করছে। বহুজাতিক ক্রেতাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া স্বচ্ছ নিলামের মাধ্যমে চায়ের উচিত মূল্য নির্ধারণব্যবস্থাকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নিলামে দামের ওঠাপড়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশ থেকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে চা আমদানিকে দায়ী করে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, ওই আমদানির পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ২০০২-২০০৩ সালে ১৩.৭ লক্ষ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ লক্ষ কেজিতে পৌঁছেছে। কিন্তু তা এখনও ভারতে চায়ের মোট চাহিদার ২.৮ শতাংশ মাত্র। তাই কম দামে আমদানি কোনওভাবেই চা-শিল্পের সংকটের কারণ হতে পারে না।

চা-শিল্পের চরিত্রকে মাথায় রাখলে বলা যায় যে, কিছু সময়ের জন্য চায়ের দামের নিম্নগামী প্রবণতা মোটেই কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কয়েক বছর ভাল অবস্থায় চলার পর কয়েক বছর কিছুটা খারাপ সময় আসে। পরিস্থিতি আবার উলটো মোড় নেয়, সুদিন ফিরে আসে, বেশ

বড় বড় বহুজাতিক চা কোম্পানি এই একচেটিয়া জোট গঠনের মাধ্যমে অসৎ উপায় অবলম্বন করে চেষ্টা চালিয়ে যায়, যাতে দাম উপরে উঠতে না পারে। বাস্তবে এই ধরনের অসাধু কাজ দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এটা নিলামপদ্ধতিকে অনেকাংশেই দুর্বল করে দিয়েছে।

ভাল রকমের লাভও অর্জিত হতে থাকে। যদি কখনও অতিরিক্ত জোগানের পরিস্থিতি আসে এবং তার ফলে দাম পড়েও যায়, আবার জোগানে ঘাটতি দেখা দিলে অস্বাভাবিক রকমের বেশি দাম পাওয়া যায়। তাই সামগ্রিক বিচারে চা-শিল্প লাভজনক কি না তা বোঝার ক্ষেত্রে এই নিম্নগামিতাকে খুব একটা বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শতাব্দীপ্রাচীন এই শিল্প সাময়িক আঘাতকে সহজেই সামলে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবুও বারবার চায়ের একচেটিয়া কারবারিরা এই নিয়ে অযথা চিৎকার-চেঁচামেচি করে। ১৯৯৮-২০০৪ সালের মধ্যে দেশীয় বাজারে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির হার চায়ের উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের থেকে বেশি ছিল। ফলে চা উৎপাদনের হার যদি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি না করা হয় তাহলে দেশীয় বাজারের চাহিদা মেটানোর পর রপ্তানি করার জন্য চা অবশিষ্ট থাকবে না। দেশীয় বাজারে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভবিষ্যতে ভারতকে বাইরের উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে চা

সব বাগানেই কাজ শুরু হয়েছে আবার কি হাসবে বাগানগুলো? না কি আশার ছলনে ভুলিনু কি ফল লভিনু হায়

আমদানি করতে হতে পারে এবং তা করতে ব্যর্থ হলে দেশীয় বাজারে চায়ের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যবর্তী ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। সম্প্রতি মার্কেট অ্যানালিসিস রিপোর্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, নামী কোম্পানির চায়ের চাহিদা বছরে গড়ে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে লংকাপাড়া, হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া, গ্যারাগান্ডা, বীরপাড়ার ডানকানস সাম্রাজ্যে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে যেটা মনে হয়েছে যে, একদা অত্যন্ত লাভজনক এই বাগানগুলির হাজার হাজার শ্রমিক অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছে। সমস্যাটা মূলত নগদ টাকার অভাব, যা প্রতিফলিত হয়েছে কার্যকর মূলধন অর্থাৎ ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ঘাটতি এবং স্থায়ী বিনিয়োগের কাজ অর্থাৎ ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে। ব্যাঙ্ক লোনের অপব্যবহারও এই সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। ফলে ঋণের বোঝা বিপুলাকার ধারণ করেছে। এই সংকট চারদিকেই ব্যাপ্তি পেয়েছে— উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস, সামাজিক ব্যয়বরাদ্দ খাতে। চা-বাগানের রুগ্‌ণতা বিগত কয়েক দশকে আর্থিক কদাচার, কেলেঙ্কারি তথা কপটতাপূর্ণ পরিচালনব্যবস্থার ফল। এই শতাব্দীর শুরুতেই সার কারখানার রুগ্‌ণতার জন্য 'ডিল' আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে। এই সংকট ধীরে ধীরে বাগিচাগুলিতে সঞ্চারিত হয় এবং সম্প্রতি তা একেবারেই পরিস্থিতির বাইরে চলে যায়। বেশির ভাগ বাগান অচল বা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে। 'ডিল' বা ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর অর্থাভাবের জন্য দায়ী এর অলাভজনক সার কারখানা দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে চলার ফলে যার কার্যকর মূলধন বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং মূলধনী ব্যয় বা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। এই প্রয়োজন দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ চা-বাগিচাগুলির পুঁজি এবং মুনাফার একটা অংশ পাচার করে দেয়। ফলে চা বিভাগ আর্থিক দিক থেকে প্রায় দেউলিয়া হয়ে যায়। অসাধু মালিক শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস, র‍্যাশন, জ্বালানি, চিকিৎসা পরিষেবা— সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে। এমনকি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকাও গায়েব করা হয়।

ডানকানসের চা-বাগানের সংকট আসলে আর্থিক কদাচার এবং কপটতাপূর্ণ পরিচালনব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণাম। চা-শিল্পের চক্রবৎ ওঠানামাকে এর জন্য কিছুতেই দায়ী করা চলে না। আর্থিক অনটনের মুখে পড়ার ফলে পুরনো গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ রোপণ, যাকে বলা হয় আপরুটিং এবং রিপ্ল্যান্টেশন, বাগানের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গা পূরণ করা বা ইনফিলিং রিজুভিনেশন, নিকাশি ব্যবস্থা, সেচ ইত্যাদি কাজ, যেগুলি বাগানের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য আশু প্রয়োজন, সেটুকু করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ডানকানসের বাগানের গাছগুলোর অধিকাংশই উদ্‌বেগজনকভাবে পুরনো। পঞ্চাশ বছরের অনেক পুরনো গাছের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য মূলধনি খাতে অর্থাৎ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু নগদ টাকার অভাবের ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য বিন্দুমাত্র প্রয়াসও নেওয়া হয়নি। এইভাবে স্থায়ী অর্থাভাব ডানকানসের বাগানগুলিকে ভয়ংকর ধরনের পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই অর্থাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে ফ্যাক্টরি পরিকাঠামোর জরাজীর্ণ দশার মধ্যেও। পুরনো যন্ত্রপাতি বদলানো এবং ফ্যাক্টরিগুলির মেরামতির কাজ বহুদিন আগেই করা উচিত হলেও, করা হয়নি। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং খরচ বা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধার অপব্যবহার করার ফলে ব্যাঙ্ক এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে। এদের নীতিহীন এবং অমার্জনীয় অপরাধের জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে সেই সমস্ত চা-শ্রমিককে, যারা ডানকানস সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদের মেরুদণ্ড।

রূপসী ডুয়ার্স

চুলের সমস্যায় ozone

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান **মালা দাস**

বর্তমান যুগে চুল পড়া ও খুসকির সমস্যা ঘরে ঘরে। বয়সের কোনও সীমারেখা নেই। চুল সকলের চেহারার সৌন্দর্য। চুল উঠে গেলে বা টাক পড়ে গেলে চেহারার আভিজাত্য কমে যায়।

এর জন্য একজন বিশেষজ্ঞর কাছে গিয়ে চুল ও scalp-টা ভাল করে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

এই সমস্যা থেকে ozone সাহায্য করবে। ozone নূতন যুগে নূতন আলোরণ ফেলেছে। oxygen (2)-টা ozone (03) convert করে চুলের shaft-এ কাজ করে। Ozone therapy stimulates the production of hair cells এবং Follicles চারপাশের ছোট ছোট blood vessels গুলোকে সতেজ করে তোলে। এর ফলে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং চুলের স্বাস্থ্য উজ্জ্বল হয়। Ozone therapy-এর সাহায্যে অকালপক্কতা এবং চুলের নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

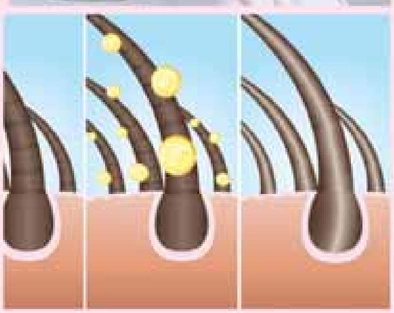

Ozone therapy দিয়ে চুলের ঘনত্ব বাড়ানো যায়।

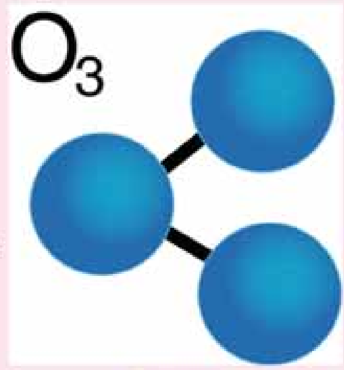

চুল পড়ার অনেক কারণ হয় যেমন— Hormonal imbalance, psychological সমস্যা Dandruff, Scalp disorder, নানা ধরনের Infection, Genetic কারণ, Pollution ইত্যাদির জন্য চুলের Follicles-এর সমস্যা দেখা দেয়। চুলের নানা ধরনের colour থেকে চুল পড়ে থাকে। Ozone-এর নানা ধরনের treatment হয়ে থাকে। যেমন— Rectal ozone therapy, Ozone meso therapy, Ozone bone therapy.

Ozone therapy দিয়ে Fungal Infection ঠিক করা যেতে পারে। Ozone আপনাকে অসাধারণভাবে সাহায্য করতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিন।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

AANGONAA
Ladies Beauty Clinic

Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional

7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001 Satyajit Sarani, Shivmandir

Call : 9434176725, 9434034333

‘হে ভারতভূমি, ভুলিও না তুমি শত শহীদের স্বর্গ’

আগস্ট বিপ্লবের ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর জন্য কলম ধরলেন **দেবপ্রসাদ রায়**।

আগস্ট বিপ্লবের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষে আমরা একটা তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। ৯ আগস্ট, ’১৬-তে এই যাত্রার শপথ গ্রহণ করে আমরা বর্ষব্যাপী যাত্রায় কেদারনাথ যাইনি, গিয়েছি মাতঙ্গিনী হাজরাকে প্রণাম জানাতে তমলুকে। আমরা হরিদ্বারে যাইনি, গিয়েছি হাজরা পার্কে শহীদ যতীন দাসকে প্রণাম জানাতে। আমরা পুরী যাইনি, গিয়েছি চন্দননগরে শহীদ কানাইলাল দত্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে। আমরা কালীঘাট যাইনি, গিয়েছি খিদিরপুরে বিনয়-বাদল-দীনেশকে প্রণাম জানাতে। দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, গিয়েছি খড়দহে শহীদ সূর্য সেনের মূর্তিতে পুজো দিতে। মহাকাল যাইনি, দার্জিলিং গিয়েছি ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে প্রণাম জানাতে। তারাপীঠ যাইনি, গিয়েছি শ্রীরামপুরে শহীদ গোপীনাথ সাহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে। তিরুপতি যাইনি, গিয়েছি ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডেকে পুজো দিতে। মীনাক্ষী মন্দিরে যাইনি, গিয়েছি কৃষ্ণনগরে শহীদ বসন্তকুমার বিশ্বাসকে স্মরণ করতে। জল্পেশ যাইনি, জলপাইগুড়ি গিয়েছি শহীদ বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তকে প্রণাম জানাতে। বর্গভীমা মন্দিরে যাইনি, গিয়েছি মেদিনীপুরে সত্যেন বোসকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে।

অন্ধ্রপ্রদেশে নাগার্জুন সাগর বাঁধ উদ্বোধন করতে গিয়ে নেহেরুজী বলেছিলেন, আজ temple of humanity-র উদ্বোধন হল। আর আমরা বারো মাস ব্যাপী দশটি temple of martyrdom-এ পুজো দিলাম। যদি নবরাত্রি দশ দিন ধরে চলে, রমজানের রোজা যদি এক মাস রাখতে হয়, তাহলে ’৪২-কে এক বছর ধরে স্মরণ করতে হবে। কারণ ’৪২ না হলে ’৪৭ হত না। আর ’৪৭ না হলে অনুকূল বাতাবরণে প্রতি বছর নবরাত্রি আর রমজান পালন করা যেত না।

এই যাত্রায় দুটো জিজ্ঞাসা বারবার মনের মধ্যে উঁকি মেরেছে। এক, যদি অহিংসাই কংগ্রেসের হাতিয়ার হবে, তাহলে মাস্টারদা একসাথে কংগ্রেস ও চট্টগ্রাম লিবারেশন আর্মির দায়িত্ব পালন করলেন কী করে? কেন তবে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শরৎচন্দ্র বোস স্যুটকেসে তাজা বোমা লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে সূর্য সেনকে দিয়ে বলবেন, এগুলি রাখো। তোমার কাজে লাগবে। বিপ্লবে ব্রত নেওয়ার পর গোপীনাথ এসে হুগলি জেলা কংগ্রেস অফিসে যখন থাকতে শুরু করল, হুগলি জেলার কংগ্রেস নেতারা নিশ্চয় জানতেন, কেন গোপীনাথ বাড়ি ছেড়ে সেখানে রয়ে গেল। বলার উদ্দেশ্য হল, জাতীয় স্তরে কংগ্রেস অহিংসাকে হাতিয়ার করেছে ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় স্তরে সশস্ত্র আন্দোলনকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়েছে বলেই ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে।

দুই, আমরা সেই বীরদের মন্দিরে গিয়েছি, যাঁদের উদ্দেশে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন—

‘ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি বন্দুক, বোমার আগুনে
আজও রোমাঞ্চকর।’

এই পরিক্রমায় যদিও খুঁজেছি সিরাজুল হক আর সামসুল হককে, যারা হুগলি বিদ্যামন্দিরে গোপীনাথের সঙ্গী ছিল, কিন্তু দেখা পাইনি। কেউ বলতে পারেনি, ওরা কোথায় গেল। কী পরিণতি হল। অথবা মীর আহমেদ মৌলভী, যাকে বক্সায় আনা হয়েছে দেখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম যোদ্ধা বিধু সেন লিখেছেন— ‘আমার পাশের সেলে ওনাকে দেখে একটু স্বস্তি পেলাম, অন্তত একজন সহযোদ্ধা পাশে আছে।’ তাঁরও কোনও খোঁজ পাইনি। তাদের অন্বেষণের দায়িত্ব আজকের প্রজন্ম যদি গ্রহণ করে তাহলে মনে করব এই তীর্থযাত্রা সফল হয়েছে।

‘ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী’তে রামচন্দ্র গুহ বলছেন জন স্ট্রেচি বলে একজন ব্রিটিশ ভারতে কর্মরত থাকাকালীন তার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে বলেছে যে, ব্রিটেন এবং স্পেনের ভেতর যত পার্থক্য, বাংলা এবং পাঞ্জাবের ভেতর তার চেয়ে বেশি পার্থক্য। তবুও ব্রিটেন ও স্পেন দু’টি দেশ, কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাব— একই দেশের দু’টি প্রদেশ। এর রসায়নটি কী?

ভারত, ভারত ছিল কেবলমাত্র সম্রাট অশোকের শাসনকালে, অন্ততঃ ইতিহাস তাই বলে। তারপর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশ শাসন করেছে। তবুও ভারত আজ এক দেশ, তার কারণ সম্ভবতঃ তিনটি লেগাসি। এক, শঙ্করাচার্যের লেগাসি। যিনি ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি পীঠ স্থাপন করে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে জুড়েছিলেন। দুই, ব্রিটিশ শাসনের লেগাসি। যারা সারা দেশে একই প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোর মাধ্যমে দেশের একীকরণের কাজটিকে ত্বরান্বিত করেছিল। তিন, গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের লেগাসি। যার সূত্রপাত ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের বলিদানের ভেতর দিয়ে। যে ৩৩৯ জন সেদিন শহীদের ইতিহাস লিখেছিলেন, তার ভেতর হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈশাই— সবাই ছিলেন, এবং স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে যে শেষ বলিদান ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের ভেতর দিয়ে, সেই আত্মবলিদানের বেদীতে যেমন রামবাবু ভগবতী, বালকৃষ্ণ ভাস্করের নাম লেখা আছে, তেমনই মহম্মদ জামাল, হানিফ হারুণ, লুই ফার্নান্ডেজেরও নাম লেখা আছে। আর কে নেই? মণিপুরে বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিং, নাগাল্যান্ডের রানি গুইদালু, অসমের কনকলতা বরুয়া, বাংলার মাতঙ্গিনী হাজরা, বিহারের যুবসাহানী, উত্তরপ্রদেশের আসফাকুল্লা, ঠাকুর রোশন সিং, উত্তরাখণ্ডের দেব সুমন, পাঞ্জাবের ভগৎ সিং, উধম সিং, কর্তার সিং সরাবা, হিমাচলে দল বাহাদুর থাপা, মহারাষ্ট্রে আবদুল রসুল, বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে, গুজরাটে শ্রীশ কুমার, কর্ণাটকে কিট্টুর রানি চেনাম্মা, তামিলনাড়ুতে ভেলুথাম্পী, ভাঞ্চী আয়ার, কেরালার পিটিকে মাধবন— সারা দেশের মানুষকে বলিদানের ইতিহাস এক সুতোয় গেঁথে রেখেছে। না ধর্ম প্রতিবন্ধক হয়েছে, না জাত, না ভাষা, না বর্ণ। তাই এ দেশকে দেখে জন স্ট্রেচিরা বিস্মিত হন।

যারা এই ইতিহাসকে লেখেনি, অংশগ্রহণ করেনি, তারা এই ইতিহাসকে আজ বদলাতে চাইছে। কারণ যতদিন এই ইতিহাস অক্ষত থাকবে ততদিন ভারত

ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে। আসফাকুল্লা আর বিসমিলের ইতিহাস রাম আর রহিমকে এক করে রাখবে। তাই আজ যে গুজরাট গান্ধীজীকে দিয়েছে, সেই গুজরাট থেকে আওয়াজ উঠছে গান্ধী নাকি 'চতুর বানিয়া' ছিলেন। যদিও আইনস্টাইন বলেছেন, 'একদিন পৃথিবী বিশ্বাস করবে না যে এই রকম একজন মানুষ এর উপর পদচারণা করে গিয়েছেন।' কিন্তু তাতে কী আসে যায়! গান্ধী মানেই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মানেই ধর্মনিরপেক্ষতা। তাঁকে থাকতে দিলে সংখ্যালঘুদেরও শাসনব্যবস্থায় থাকতে দিতে হয়। সেটা কী করে সম্ভব! গুরু গোল ওয়ালকার তো বলেছেন, 'উই অর আওয়ার নেশানহুড ডিফাইনড'-এ— '...ওদের নাগরিকত্বও দেওয়া যাবে না।' তাই ওদের কী করে প্রার্থী করা যাবে! সেই জন্যই ইউপি-র ৪০৩টি আসনের একটিতেও ওদের স্থান হল না।

দেশের প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ (বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত) দিতে গিয়ে স্বচ্ছ ভারত রাখার প্রশ্নে কেবলমাত্র 'হামারি মন্দির' বলেছেন, মসজিদ, গীর্জা, গুরুদ্বারা বলছেন না। প্রথা ভেঙে ইফতার দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। আর সংখ্যালঘুদের সমাবেশে 'স্কাল ক্যাপ' পরাতে চাইলে আপত্তি করে বুঝিয়ে দেন, এ পরিচ্ছদের সাথে একাত্ম হতে তিনি রাজি নন।

তাই গোমাংস রাখার মিথ্যা অভিযোগে যখন আখলাক নিহত হয় দাদারীতে, পেহলু খান নিহত হয় আলোয়ারে, জুনেইদ প্রাণ হারায় ট্রেনের কামরায়— আশ্চর্য হই না। কারণ সর্বোচ্চ আসন থেকে যদি প্ররোচনা আসে তাহলে 'গোপুত্রদের' তাণ্ডব তো চলবেই এবং ভবিষ্যতে আখলাখ বা জুনেইদদের পরিবার যাতে কোনও অভিযোগ করবার জায়গা না খুঁজে পায় তার জন্য 'সংখ্যালঘু কমিশন' তুলে দেবার কথা বলা হচ্ছে।

কৃষক মরছে হয় বিষ খেয়ে, না হয় পুলিশের গুলি খেয়ে। কর্মসংস্থানের পরিবর্তে আজ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মসঙ্কোচনের কালো মেঘ জমাট বেঁধেছে। এনপিএ-র ফলে ব্যাংকগুলি যাতে লাল বাতি না জ্বালে তার জন্য 'নোটবন্দি' করে বিজয় মালিয়া, অনিল আম্বানি, গৌতম আদানীদের বাঁচানো হল।

রাজনৈতিক দর্শন একটা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির অভিমুখকে নির্ধারিত করে। ধর্মনিরপেক্ষতার মূলকথা, সকলের সমান অধিকার। তা মানতে হলে কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। তাই কর্পোরেটকে বাঁচাতে, তার স্বার্থ রক্ষা করতে ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন ব্যাখ্যা দাও। 'কম্পোজিট কালচার'-এর বদলে 'ওয়ান নেশন ওয়ান কালচার-এর তত্ত্ব তুলে ধরো।' আর তার জন্য গান্ধীর প্রদর্শিত সহিষ্ণুতার আধারে প্রতিষ্ঠিত বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ গণ-আন্দোলনের লেগাসিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দাও। ভারতবর্ষের মতো বহু জাতির, বহু ধর্মের, বহু ভাষার দেশে আজ তাই সহিষ্ণুতার অভাবে গণতন্ত্র বিপন্ন বোধ করছে।

এই পরিণতির জন্য আমরাও নিজেদের দায়কে অস্বীকার করতে পারি না। হয়ত আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেশে একটা সেকুলার সরকার ধরে রাখতে পেরেছি। একটা সেকুলার সংবিধান দেশকে দিতে পেরেছি। কিন্তু দেশটাকে, সমাজটাকে সেকুলার বানাতে পেরেছি কি? একটা ইতিহাস পড়িয়েছি, যেখানে শিবাজীর বীরগাথা আছে, কিন্তু তার প্রধানমন্ত্রী হায়দার আলির উল্লেখ নেই, রাণা প্রতাপের বীরগাথা আছে কিন্তু তার সেনাপতি হাকিম সুরের কোনও উল্লেখ নেই। ছোটদের ইতিহাসে 'সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহে'র উল্লেখ নেই, তাই আজকের প্রজন্ম ভবানী পাঠককে ডাকাত বলে জেনেছে— আর মজনু শাহের নামও শোনেনি। ১৮২২ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত সংঘটিত ওয়াহবী আন্দোলন পড়বার সুযোগ পায়নি। তাই তিতুমিরের প্রকৃত নাম যে মীর নিশার আলি তা জানবার অবকাশ হয়নি। ওয়াহবী আন্দোলনের সময় মৌলানা-মৌলভীরা রুটি আর রুমালের সঙ্কেতে যদি সৈন্য শিবিরে শিবিরে প্রচার না করত, তাহলে ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ হত না। আর সেই বিদ্রোহ কেবল বাহাদুর শাহ জাফরকে নেতার আসনে বসায়নি, চাঁদনি চকে আহমেদ আলি খান আর নাহার সিংকে একযোগে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিতে দেখেছে। হরিয়ানার হুকুম চাঁদ জৈন ও মীর্জা মুনির বেগকে একসাথে আত্মবলিদান করতে দেখেছে। ১৮৭৬-এ বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে লড়াই করেছে মহারাষ্ট্রে, তার পাশে ইব্রাহিম খাঁ রহিলা এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পাশে পাশে কোরবান হোসেন ও হাসিমুদ্দিন আহমেদ পা মিলিয়েছে। ১৯১৬-তে আফগানিস্তানে প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট ঘোষিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হয়েছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বরকতুল্লা। ১৯২০-তে গান্ধীজি খিলাফৎ আন্দোলনকে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন, পাশে থেকেছে মহম্মদ আলি, সৌকত আলি। পাঠ্য ইতিহাসের পাতায় এরা যোগ্য স্থান পায়নি। আর আসফাকুল্লা, বিসমিলরা আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ, মুজিবরের সময়ে যে দেশ ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষিত হয়েছিল, পরবর্তীতে তাকে ইসলামিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আজও তাই আছে। তবুও সেখানে একটা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব আছে— পয়লা বৈশাখ। এ দেশে সংবিধানে আজও 'সেকুলার' শব্দটা টিঁক আছে— ৭০ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, আমরা 'বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ' হয়েও কোনও জাতীয় উৎসব গড়ে তুলতে পারিনি যাকে 'নন রিলিজিয়াস ফেস্টিভাল' বলা যায়। তাই দেশের সরকারটা সেকুলার থাকলেও কিন্তু সমাজটা আস্তে আস্তে গান্ধীর লেগাসিকে ম্লান করে শঙ্করাচার্যের লেগাসিটিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

তবুও একটা সহিষ্ণুতার বাতাবরণ নেহেরু, ইন্দিরা, রাজীবজিরা তৈরি করতে পেরেছিল বলেই, যে দেশে এক সময় ইউসুফ খানকে দিলীপকুমার নাম নিতে হয়েছে, তালাত মাহমুদকে তপনকুমার নাম নিতে হয়েছে অথবা মেহজবিন খান বক্সকে মীনাকুমারী নাম নিতে হয়েছে, সে দেশে আজ শাহরুখ খান, সলমান খান বা জরিনা ওয়াহাবকে— অমিত, সুমিত, কল্পনা— নাম নিতে হয়নি। কিন্তু ইতিহাসের চাকাটাকে আস্তে আস্তে পেছন দিকে ঘোরানো হচ্ছে। তবুও বলি, তাঁদের উদ্দেশ্যে, যাঁরা গান্ধীকে 'বানিয়া' বলেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে চারবার মুচলেকা দিতে হয় যে ব্যক্তিকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, হিন্দু যুবকদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করল যে মানুষটি, সেই সাভারকরকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ বীর বলে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা যাঁরা করছেন, তাঁরা অযোধ্যায় মন্দির বানাতে পারবেন কি না জানি না, কিন্তু প্ররোচনা এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারে যে মরিশাসে নবীন রাম গুলামের মন্দির ভাঙবে, ফিজিতে হরিশ চৌধুরীর মন্দিরটা ভাঙবে, গায়নায় ছেদি জগনের মন্দিরটা ভাঙবে আর ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে বাসদেও পাণ্ডে আর বিশ্বেশ্বর কমলা প্রসাদের মন্দিরটা ভাঙবে। কারণ সারা পৃথিবীতেই আজ মৌলবাদের দাপাদাপি।

আর আপনারা কোথাও তাদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন না, কারণ আপনি আছেন কেবল এখানে আর নেপালে। আর দেশের ভেতর গণতন্ত্রের মন্দিরটা ভাঙবে। কারণ ৮২ শতাংশ হিন্দুর দেশে যদি মৌলানা আজাদ, সীমান্ত গান্ধী, আসফাকুল্লা, বাহাদুর শাহ জাফর, শের আলি, তিতুমির, মৌলানা আলাউদ্দিনের ইতিহাস মুছে দেওয়া যায় তবে ১৮ শতাংশ মানুষ কোনও দিনই ৮২ শতাংশ মানুষকে নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না। আর সেদিন গণতন্ত্রের স্থান নেবে স্বৈরতন্ত্র— যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

কোন পথে চলেছে দার্জিলিং পাহাড় ?

বন্ধ চলছে পাহাড়ে। অশান্ত পাহাড় শান্ত করতে আদালতের নির্দেশে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী নেমেছে। কিন্তু কী হবে পাহাড়ে? পাহাড় কি শান্ত হবে? নাকি এভাবেই চলতে থাকবে! এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে, এই কারণে যে পাহাড়ে টানা বন্ধ চলতে থাকায় খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। সমতল থেকেও খাদ্য বোঝাই গাড়ি পাহাড়ে সেভাবে যাচ্ছে না। তারপর গোয়েন্দাদের খবর, নেপাল থেকে আসা মাওবাদীরা পাহাড়ে এসে আগুন লাগাতে মদত দিচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের খবর, পাহাড়ের এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুঙের হাত ধরে। কিন্তু এখন আর তা গুরুঙের হাতে নেই। কেননা, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ছাড়া অন্য পাহাড়ের দলগুলো এখন একত্রিত হয়েছে। যেমন জিএনএলএফ, সিপিআরএম, গোর্খা লিগ, জন আন্দোলন পার্টি, সব একসঙ্গে। এই অবস্থায় গুরুঙের এখন উভয়সংকট। গুরুং বাদে মোর্চার অন্য নেতারাও আর সেভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে আসছেন না। গুরুং এখন সামনেও আসতে পারছেন না। কারণ, তাঁর এখন উভয়সংকট। একদিকে বহু মামলার পাহাড় ঝুলছে তাঁর উপর। সাম্প্রতিক গোলমালের জেরে বহু জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছে গুরুঙের বিরুদ্ধে। ফলে মামলা ছাড়া আন্দোলনের রাশ আলগা করে দিয়ে তাঁকে দিল্লিতে গিয়ে আগাম কথা বলতে হলে পাহাড়ের বাকি দলগুলো ছেড়ে কথা বলবে না। এর আগের পর্বে গুরুংদের শুরু করা আন্দোলনে গুরুঙের হাতে রাশ থাকায় তাঁরা বন্ধ আন্দোলন শিথিল করেছিলেন। তাতে অন্তত কিছু পাহাড়ের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। এবার এক মাস হয়ে গেলেও বন্ধে কোনও বিরাম নেই। অন্তত সব দলের মাধ্যমে তৈরি হওয়া গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্ট কমিটির মুখপাত্র নীরজ জিম্বা শনিবার পরিষ্কারই বললেন, আন্দোলন আরও তীব্র হবে। কিন্তু পাহাড়ে যে মানুষ খাদ্যসামগ্রী পাচ্ছেন না, সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এর দায় রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। রাজ্য সরকারের জন্যই পাহাড়ের মানুষ খাদ্য পাচ্ছেন না বলে তাঁর অভিযোগ।

আন্দোলনকারীদের মূল দাবি, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড। কিন্তু পৃথক রাজ্য দেওয়া সম্ভব নয় বলে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোর্খাল্যান্ড রাজ্য দেওয়া যাবে না বলেই গোর্খাদের আইডেন্টিটির জন্য জিটিএ দেওয়া হয়েছিল। পাহাড়ের এই পরিস্থিতিতে অনেকে সুবাস ঘিসিঙের ষষ্ঠ তফসিলের কথা বলছেন। রাজ্য নয় অথচ রাজ্য এমন বিষয় ষষ্ঠ তফসিলেই হতে পারে বলে পাহাড়ের অনেকে বলা শুরু করেছেন। ফলে সমাধানসূত্র হিসাবে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের বিকল্প হিসাবে ষষ্ঠ তফসিলের কথা অনেকে বলছেন। বিগত দিনে ইউপিএ সরকারের সময় ষষ্ঠ তফসিল হবে বলে সিদ্ধান্তও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজকের বিমল গুরুং ঘিসিঙের ষষ্ঠ তফসিলের তীব্র বিরোধিতা করাতে তাঁকে পাহাড় ছাড়তে হয়েছিল। যদিও সময়ের নিয়মে গুরুং গোর্খাল্যান্ডের নামে আগুন জ্বালানোর যে রাজনীতি শুরু করেছেন, তাতে আজ তাঁকেই পরোক্ষভাবে মরতে হচ্ছে। কেননা, তিনি এখন আত্মগোপন করে রয়েছেন। আর বিপদে পড়েই তিনি পাহাড়ের সব দলকে

সঙ্গে নিয়ে তিনি বাঁচতে চেয়েছেন। কিন্তু এখন আর রাশ নিজের হাতে রাখতে পারছেন না। অন্য দলগুলোর নেতারাও গুরুংকে আর রাশ ধরতে দিতে চান না বলেই বিভিন্ন মহলের খবর। এখন আগের মতো গুরুং বা তাঁর সঙ্গীসাথিরা দিল্লি গিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তা অন্যরা মেনে নেবেন না। আর তা যদি গুরুং চেষ্টাও করেন, তবে পাহাড়ে তাঁকে আরও বিপদে পড়তে হবে বলেই অনেকে বলা শুরু করেছেন। যদিও গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্ট কমিটির মুখপাত্র নীরজ জিম্বা বলেন, 'এখন একটাই দাবি, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড। আর ষষ্ঠ তফসিল এখন ক্লোজ্‌ড চ্যাপটার।'

কিন্তু আন্দোলনের নামে যে আগুন জ্বলছে সেখানে, অভিযোগ উঠছে, নেপালের মাওবাদীরা এর পিছনে রয়েছে। একদা গুরুং-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা প্রদীপ প্রধান বলেন, পাহাড়ের এই আন্দোলন থেকে সেখানকার সব দল যে যার মতো নিজেদের সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধি করতে মরিয়া। এরকম চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠবে। সে ক্ষেত্রে সাংসদকে উদ্যোগী হয়ে সেতু হিসাবে কাজ করে আলোচনার প্রয়াস নিতে হবে। কিন্তু সাংসদ কি আর সেই উদ্যোগ নেবেন? এখন পর্যন্ত পাহাড়ে ব্যাপক আগুন জ্বলতে থাকলেও সাংসদের কোনও ভূমিকা দেখা যায়নি। তাঁর কোনও বিবৃতিও দেখা যায়নি। তিনি এই এলাকার বাসিন্দা নন। তিনি বাইরে থেকে এসে সাংসদ হয়েছেন। আগামী লোকসভা ভোটে তিনি এখানে প্রার্থী হবেন কি না তা নিয়েও নিশ্চয়তা নেই। আর তিনি

এখানে প্রার্থী হবেন না বলেই অনেকে বলা শুরু করেছেন। কেননা, তিনি নাকি তাঁর নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দিয়েই বার্তা দিচ্ছেন, তিনি আর এই কেন্দ্রে সাংসদ হওয়ার প্রয়াস নেবেন না।

তবে কী হবে দার্জিলিং পাহাড়ের? কারণ, দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দার্জিলিং। একপাশে নেপাল, আর একপাশে ভুটান। তার সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, পাশে রয়েছে চিন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চিন তার আগ্রাসী মনোভাব প্রকাশ করছে বলে ইতিমধ্যে ভারতের সঙ্গে চিনের অনেক ক্ষেত্রে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দার্জিলিঙে আগুন জ্বলতে থাকলে তা দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কতটা শুভ হবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অতীতে দেখা গিয়েছে, দার্জিলিঙের আন্দোলনকারীরা, এমনকি সুবাস ঘিসিং পর্যন্ত দার্জিলিং ভারতের অঙ্গ নয় বলে চিৎকার করেছিলেন। দার্জিলিং একটি 'নো ম্যান'স ল্যান্ড' বলেও সেই সময় চর্চা হয়। আর সেই কারণে দার্জিলিং যদি স্থায়ী কাশ্মীরের মতো আগুনের স্থান হয়ে ওঠে, তবে তা তো উদ্‌বেগজনকই বটে। তা ছাড়া ভারত বিরোধী শক্তিরা দার্জিলিংকে ঘিরে বৃহত্তর নেপাল গড়ার কথাও অনেক সময় বলে আসছেন। তাই দার্জিলিঙের পরিস্থিতিকে সামাল দিতে এখন রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রকেও অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। একে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুতর দিক হিসাবে চিহ্নিত করে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে বলে কিছু মহল থেকে অভিমত দেওয়া শুরু হয়েছে।

বাপি ঘোষ

৫২

তরঙ্গ উত্তরঙ্গ

গোপাল ঘোষের বাড়িতে দলবল নিয়ে বিজয়া করতে গিয়েছিলেন নিত্যদা। সেখানে খোশগল্পের মাঝে রবি ঠাকুরের সেক্রেটারির লেখা চিঠির কথা উঠতে গোপাল ঘোষ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত গলায় বললেন, ‘চিঠিতে কি আসার কথা লিখেছে নিত্য?’

নিত্যদা বললেন, ‘আসবেই, সেটা অবশ্যি লেখেনি। আমি সঙ্গেই এনেছি। দেখুন না একবার!’

পকেট থেকে একটা সুন্দর খাম বার করে এগিয়ে দিল নিত্যদা। সেটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখে ভিতর থেকে ভাঁজ করা চিঠিটা বার করলেন গোপাল ঘোষ। দু’-তিনবার পড়ে বুঝলেন যে চিঠিটা বেশ রহস্য করে লেখা। রবিবাবুর সেক্রেটারি নিজে লেখেননি। তাঁর হয়ে অন্য কেউ লিখেছে। সংক্ষিপ্ত চিঠিতে বলা হয়েছে যে, আগামী দিনে রবিবাবু যে দার্জিলিং বা কার্শিয়াং যাবে না, সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই। গেলে জলপাইগুড়ির উপর দিয়েই যাবেন। যাওয়ার সময় যে তিনি এক-দু’দিনের জন্য সেই শহরে থাকতে চাইবেন না— এটা ভাবার এখনই কোনও দরকার পড়ছে না। কিন্তু উদ্যোক্তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রবিবাবুর বয়স হয়েছে।

চিঠি ফেরত দিয়ে গোপাল ঘোষ ভাবিত গলায় বললেন, ‘আমার মনে হয় কী জানো নিত্য— কেউ একজন বকুলপুরে গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলে ভাল হবে। দেখা করে অনুরোধ করলে তিনি নিশ্চয়ই ফেরাতে পারবেন না!’

‘ইয়ে— ওটা বোলপুর হবে!’ নিত্যদা বিনীত গলায় ভুল শুধরে দিলেন, ‘কিন্তু বোলপুরে যাওয়া মানে তো কিছু খরচ-খরচার ব্যাপার। দেখা গেল, সেখানে কয়েকদিন থাকতে হচ্ছে।’

‘কিছু খরচ মানে?’ গোপাল ঘোষকে অত্যন্ত বিস্মিত দেখাল, ‘এর জন্য ফন্ড বানাতে হবে। রবি ঠাকুর টাউনে আসা মানে কি চাট্টিখানি ব্যাপার নিত্য? তিনি কি একা আসবেন ভেবেছ? তারপর ধরো আসার ব্যাপারটা— আমাদের দু’-তিন কামরার একখানা আস্ত ট্রেন না ভাড়া করতে হয়!’

নিত্যদা এতটা ভাবেননি বলে থতমত খেয়ে বললেন, ‘তা-ই তো!’ তাঁর দলের বাকিদের মুখ দেখে মনে হল, তারাও ভাবেনি এতসব। রবি ঠাকুর ভোর ছ’টায় শেয়ালদা থেকে আসা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের কামরা থেকে মালপত্র সমেত নেমে কুলি খুঁজবে— এইরকম একটা ছবিই তাদের ধারণায় ছিল।

‘তার মানে একটা মিটিং আগে করা দরকার।’ গোপাল ঘোষ নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে

উত্তেজিত হচ্ছেন ক্রমশ। 'প্রথমে দরকার একজনকে। বোলপুর পাঠাবার খরচ, মিটিং করে সে খরচাটা আমরা চাঁদা হিসেবে আগে তুলে নেব। আমাদের কর্তব্য কাউকে সত্বর পাঠিয়ে দেওয়া। পারলে এক সপ্তাহের মধ্যে!'

'তবে তো কাল-পরশু মিটিং ডাকতে হয়!' বলেছিল নিত্যদা। সেটা শুনে গোপাল ঘোষ ঊরুতে থাপ্পড় মেরে জানিয়েছিলেন, 'পরশু কেন? কালকেই মিটিং হোক।'

এসব গতকালের কথা। তাই আজ সন্ধে সাতটায় মিটিং বসেছে খুদিদার বৈঠকখানায়। নিত্যদার দলবল ছাড়াও তিন-চারজন বাবুও এসেছেন। এঁরা অবশ্য সকলেই পূর্ণ যুবক। গান-বাজনা-অভিনয়ে আগ্রহী। রবি ঠাকুরের গান-কবিতা এঁদের জানা। নিত্যদার মুখে মিটিং-এর সংবাদ পেয়ে নিজে থেকেই হাজির হয়েছেন। সকলেই কমবেশি উত্তেজিত। শোভাও কম উত্তেজিত নয়। সে অবশ্য বৈঠকখানায় ঢোকেনি। দরজার পাশে একটা চেয়ারে বসে ছিল। দরজার কাছাকাছি কিন্তু ঘরের ভিতরের দিকে তার মুখোমুখি বসে ছিল গগনেন্দ্র। সে অবশ্য একটু নিমরাজি হয়ে মিটিং-এ আছে। টাউনে রবি ঠাকুরের আসা নিয়ে তার উৎসাহের অভাব না থাকলেও এই মুহূর্তে তার মন অন্য কোথাও চলে যাচ্ছিল। বীরেন তাকে যেতে বলেছে সন্ধের পর। আলোচনা আছে।

পরদার ফাঁক দিয়ে বারবার শোভার দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল গগনেন্দ্রর। প্রতিবারই হাসছিল শোভা। জ্বর জ্বর ভাবটা বিকেল থেকে তেমন না থাকায় তাকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। শরীর-মন ভাল থাকলে গগনেন্দ্রর সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করাতে গিয়ে খুব একটা ক্লান্ত হয় না সে। এবার যেমন তাকাতেই সে হাসির বদলে জিব বার করে ভেংচি কাটল একটা। নিজে হেসে ফেললে সেটা বৈঠকখানায় হাজির লোকজনের চোখে অদ্ভুত দেখাবে ভেবে গগনেন্দ্র মুখ ঘুরিয়ে নিল। মিটিং-এর লোকেরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না শোভাকে।

'আলোচনা তবে শুরু করি— কী বলেন?'

খুদিদার দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইলেন গোপাল ঘোষ। মিটিং-এর সভাপতি হিসেবে খুদিদা ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি দিলেন। ধুতির কোঁচাটা পকেটে ভাল করে ঢুকিয়ে তিনি শুরু করলেন বলতে— 'আমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছি, তা আর নতুন করে বলছি না। রবিবাবুকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমাদের এখান থেকে কোনও একজনকে, ইয়ে, ওঁর ওখানে পাঠাতে হবে।' বোলপুর নামটা পুনরায় ভুলে গিয়েও ব্যাপারটা সামলে নিলেন তিনি। 'এর জন্য যে সামান্য খরচ, সেটা যে আজই উঠে যাবে, সে আশ্বাস ইতিমধ্যেই সবাই আমাকে দিয়েছেন। তাই সেটা নিয়ে আমি ভাবিত নই। আসলে আমি ভাবছি, তিনি থাকবেন কোথায়?'

সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য থামলেন গোপাল ঘোষ।

'মনে করুন, তিনি রাজি হলেন।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে কোঁচার অবস্থান যাচাই করে বলতে লাগলেন আবার, 'তারপর এক শুভদিনে তিনি লোকজন নিয়ে নামলেন স্টেশনে। তারপর? স্টেশন থেকে তিনি যাবেন কোথায়? আমাদের টাউনে তো হোটেল বলতে তেমন কিছু নেই।'

'কিন্তু টাউনে তো অনেক গুণী মানুষ আগে এসেছেন!' খুদিদা গড়গড়ায় দুটো টান দিয়ে জানালেন, 'তাঁদের থাকার ব্যবস্থা তো হয়েছিল বলেই জানি।'

'তাঁর সবাই ছিলেন রাজনীতিবিদ।' গোপাল ঘোষ বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে বলতে লাগলেন, 'তাঁদের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আছে। তাঁরা দেশের জন্য শ্মশান-জঙ্গল-মরুভূমি-জেলখানা থেকে শুরু করে রাজশয্যাতেও একইভাবে থাকতে জানেন। কিন্তু রবিবাবু হলেন পোয়েট। তিনি বিরাট জমিদারবাড়ির সন্তান।'

'থাকার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বোলপুরে গিয়ে জানা যাবে।' নিত্যদা ভরসা জোগাল।

'এই জন্যই আমি চাইছি, যত শীঘ্র সম্ভব কাউকে বোলপুরে পাঠাতে! ধরুন কোজাগরীর পরদিনই কেউ চলে যাক সেখানে।'

'একটু সময় নিয়ে পাঠালে ভাল হত না কি?' খুদিদা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'শুনেছি তিনি সবসময় বোলপুরে থাকেন না। আমরা যদি চিঠি লিখে তাঁর থাকার সময়টা জেনে নিই, তবে সুবিধে হবে।' আরও একটা টান দিলেন তিনি। তারপর গোপাল ঘোষকে সমর্থন করেই বললেন, 'ওঁর থাকার ব্যাপারটা অবশ্যি বোলপুর গিয়ে জেনে আসা যায়। এতে প্রমাণ হবে যে আমরা আন্তরিক। নিশ্চয়ই অনেক মানুষ তাঁকে বিজয়ার প্রণাম জানাতে আসবেন। অতএব কোজাগরীর পর বোলপুরে তিনি থাকলেও থাকতে পারেন।'

রবাহূত বাবুদের একজন বললেন, 'তিনি তো ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মরা কি বিজয়ার প্রণাম নেয়?'

আরেকজন বললেন, 'আচ্ছা, রবিবাবু কি ডুয়ার্সের চা-বাগান দেখেছেন?'

বিজয়ার প্রণাম নিয়ে উপস্থিত সদস্যরা রবিবাবুর পক্ষে রায় দিলেও তাঁর চা-বাগান দর্শন নিয়ে কাউকে নিশ্চিত হতে দেখা গেল না। খুদিদাও খানিক ভেবে নিয়ে জানালেন যে, যদি রবিবাবু চা-বাগান দেখতে আসতেন, তবে নিশ্চয়ই সেটা তাঁর কানে আসত। রবিবাবুর মতো বিখ্যাত মানুষ জলা-জঙ্গল-ম্যালেরিয়া পেরিয়ে চা-বাগান দেখতে কেন যাবেন— তা নিয়েও মতামত পড়ল প্রচুর।

'বেশ। তবে কে বোলপুর যাবে, সেটা ঠিক করা হোক।' আলোচনাকে আবার মূল পথে ফিরিয়ে আনতে প্রস্তাব রাখলেন খুদিদা। দেখা গেল, উপস্থিত কেউই এই দায়িত্ব নিতে রাজি হচ্ছেন না। গোপাল ঘোষ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই চাইছেন না যে, আমি বা খুদিবাবু বোলপুরে যাই! আপনাদের মতো ইয়াং জেনারেশনের কাউকে যেতে হবে। নিত্য, তুমি?'

'আমি গেলে এদিকটা কে সামলাবে দাদা?' নিত্য আমতা আমতা করে জানাল।

গোপাল ঘোষ অসন্তুষ্ট মুখে বাবুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কেউ যাক।'

তাঁরা পরস্পরকে ঠেলতে থাকায় আরও অসন্তুষ্ট হলেন গোপাল ঘোষ। বড় কাজে নামার জন্য আত্মবিশ্বাস কীভাবে অর্জন করতে হয়, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে তিনি এবার তাকালেন গগনেন্দ্রর দিকে।

'আমার মনে হয়, গগনেন্দ্রই হল রাইট পার্সন, কী বলো গগন?'

গগনেন্দ্রকে প্রায় চমকে দিয়ে বললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সভায় জোর হল্লা উঠল। সবাই একবাক্যে জানাল যে, এবার ঠিক লোককে বেছেছেন গোপাল ঘোষ। এমনকি খুদিদাও মুচকি মুচকি হেসে মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানালেন। আনন্দে শোভার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেসব প্রত্যক্ষ করে কিঞ্চিৎ দিশেহারা গগনেন্দ্র বলল, 'আমি? না না, আমি কেন?'

'নয় কেন?' প্রবল হুংকারে গগনেন্দ্রকে উড়িয়ে দিলেন গোপাল ঘোষ, 'তোমার বউ হল রবিবাবুর পরম ভক্ত! আর তুমি হলে এ শহরের জামাই! সুতরাং বোলপুরিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমার চাইতে এফিশিয়েন্ট আর কে আছে? কোজাগরীর পরদিনই তুমি রওনা হয়ে যাও।'

'অসম্ভব!' গগনেন্দ্র এবার গলায় জোর পেল, 'আমাকে আরও তিন-চার দিন সময় দিতে হবে। তা ছাড়া বাবাকে না জানিয়ে কথা দেওয়াটাও সম্ভব নয়। আমি অনেকদিন হল জলপাইগুড়িতে। বাবা জানেন যে, কোজাগরীর দু'-চার দিনের মধ্যেই জামালদহে ফিরে আসব আমি।'

কিন্তু গগনেন্দ্র যেটা বলল না তা হল, চুলোয় যাক রবি ঠাকুর! উপেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা না ঘটা পর্যন্ত বোলপুর নিয়ে ভাবার মতো তার সময় নেই। এই মুহূর্তে এখান থেকে বার হতে পারলে সে বাঁচে। বীরেন অপেক্ষা করছে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

পনির ভর্তা

উপকরণ: পনির ২৫০ গ্রাম, বড় পেঁয়াজ কুচি ২টো, সরু করে কাটা আদা ১ ইঞ্চি, ছোট টুকরো করে কাটা কাঁচালংকা স্বাদ অনুসারে, কসুরি মেথি ২ চামচ, বড় টম্যাটো ১টা (বীজ ফেলে বাটা), সাদা তেল ৫০ গ্রাম, হাফ বয়েলড ডিম ১টা (সাজাবার জন্য), ধনেপাতা ও গোটা কাঁচালংকা (সাজাবার জন্য), নুন ও চিনি স্বাদ অনুসারে, মেথি আধ চা চামচ।

প্রণালী: পনিরের টুকরোগুলো হাত দিয়ে ভেঙে দিন, যাতে পেস্ট না হয়, কিন্তু গুঁড়ো গুঁড়ো হবে। কড়াইতে প্রথমে সাদা তেল দিন ও গরম হলে মেথি ফোড়ন দিন। মেথিতে কালো রং হলে তেল থেকে তুলে ফেলে দিন। তেলে প্রথমে কুচোনো আদা দিন, তারপর পেঁয়াজ কুচি দিন ও ভাল করে কষাতে থাকুন। নুন ও মিষ্টি দিয়ে দিন। টুকরো করে রাখা লংকাগুলো দিয়ে দিন। এবার গুঁড়ো করা পনির দিন ও কম আঁচে ভাল করে নাড়তে থাকুন। ৩-৪ মিনিট নাড়বার পর কসুরি মেথি হাতে একটু গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিন ও পনিরে মিশিয়ে দিন। তৈরি হয়ে গেল পনির ভর্তা। এবার সার্ভিং ডিশে পনিরটা ঢেলে উপরে হাফ বয়েলড ডিমটাকে হাফ করে কেটে সাজিয়ে দিন। ধনেপাতা কুচি ও কাঁচালংকা দিয়ে ডিশটাকে গার্নিশ করে দিন। পরোটা, লুচি বা ফ্রায়েড রাইস দিয়ে খেয়ে দেখুন, আপনি পনির খেতে ভাল না বাসলেও এই পদটি অবশ্যই আপনার ভাল লাগবে।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch (Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

মোবাইল ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

মোবাইল ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় সাড়া মিলেছে অভূতপূর্ব। যে পরিমানে ছবি এসেছে তা এক কথায় আশাতীত। বিচারকদের ছবি নিয়ে রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে। এই অবস্থায় বাছাই করা ছবির প্রদর্শনী কোনোভাবেই পূর্বঘোষণা মত ২৮-২৯ জুলাই করা সম্ভব হচ্ছে না। তার পরিবর্তে প্রদর্শনীর নতুন তারিখ ঠিক হয়েছে **১২ ও ১৩ অগাস্ট, ২০১৭। বেলা ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। উদবোধন ১২ অগাস্ট শনিবার বিকেল ৪টেয়।** আপনাদের সহযোগিতা কাম্য।

আড্ডাঘর

দিলখোলা আড্ডা কিংবা দিল বিনিময়...

মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

দিনবাজার: শতবাজার বিকশিত হোক

দিনবাজার, কারণ বাজার বসত দিনে। করলা নদীর ধারে। কালী মূর্তির উত্তরে।

অনেক দিন অবধি দিনবাজারই ছিল জলপাইগুড়ি শহরের একমাত্র বাজার। করলা নদীর ধারে এই বাজার ঠিক কবে থেকে বসা শুরু হয়েছিল, সেটা নিশ্চিত বলা সম্ভব হয়নি। তবে ১৮৮৭ সালে বাজারটি পুড়ে যাওয়ায় বৈকুণ্ঠপুরের রানি জগদীশ্বরী দেবী সেটা পুনর্নির্মাণ করান এবং টিনের চালা বসান। এ ঘটনার দলিল আছে। উনবিংশ শতকের শুরুতে বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা তাঁদের রাজধানী জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসেন। অনুমান সেই সময়েই দিনবাজার প্রথম বসতে শুরু করেছিল করলা নদীর পাড়ে। একটি কালী মূর্তির উত্তরে বসত আদি বাজার। কালী মূর্তিটি কার দ্বারা এবং কেন প্রতিষ্ঠিত, সে তথ্যও স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ ভেবেছেন যে কালীপুজো করত ডাকাতেরা। আরেক দলের মতে, কালী মন্দির

বৈকুণ্ঠপুরের রাজারাই প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন। রাজারা আসার আগে এলাকাটি ছিল জনমানবহীন অথচ গাছপালা-জলাজঙ্গলে ভরা প্রান্তর। হয় তো তিস্তা দিয়ে যাওয়া নৌকোয় হামলা চালিয়ে ফেরা নদীদস্যুরা করলা বেয়ে এসে এখানে লুকিয়ে থাকত। দস্যু-ডাকাতদের একটা কালী পুজোর ব্যবস্থা রাখতে হয়। দিনবাজার কালীবাড়ি তেমন ডাকাতে কালী কি না — তা কে বলবে? সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের অপভ্রংশদের ঘাঁটি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গবেষকেরা।

তবে, একশো বছর আগের দিনবাজার রীতিমত জমাটি বাজার। জগদীশ্বরীদেবীর টিনের চাল দেওয়া বাজার বানিয়ে দিয়েছিলেন — সেটা টিনশেড নামে পরিচিতি পেয়ে গিয়েছে। টিনশেডের বিখ্যাত দোকান হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে ‘রায় এন্ড সন্স’ এর নাম। সে দোকান এখন কালগর্ভে হারিয়ে গেছে। আরও কয়েকটি মনিহারি দোকান সমেত কয়েকটি দশকর্মা ভাণ্ডার আর মুদির দোকান ছিল সেখানে। টিনশেড লাগোয়া ‘চক্রবর্তী ব্রাদার্স’ ছিল নামি মুদির দোকান। কালী বাড়ির দিকে ছিল অনেকগুলি কাপড়ের ভাল দোকান। মালিক সবাই বাঙালি। এদের অন্যতম রতিকান্ত সরকার আর্যনাট্যের ভাল অভিনেতা ছিলেন। পুরনো দিনবাজারের বড় ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগ ছিলেন বাঙালি। তাঁরা দিনের বেলায় ব্যবসা আর সন্ধের পর

জার্নি ডেট: ০৬/১০ ও ২৭/১২/২০১৭
(১৫ দিনের টুর, এনজেপি থেকে এনজেপি)

২১,৬০০ টাকা জনপ্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক)
১৮,৮০০ টাকা জনপ্রতি (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৬,৮০০ টাকা (৫-১১ বছর বয়সী)
৯,৬০০ টাকা (২-৪ বছর বয়সী)

টুর প্যাকেজে থাকছে
১) আপ ও ডাউন স্লিপার ক্লাসের ভাড়া
২) ডিলাক্স বাস বা টেম্পো ট্রাভেলার
৩) ফ্যামিলি প্রতি রুম
৪) সব খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ইভনিং টি, ডিনার) **(ট্রেনের খাবার বাদে)**

বেড়াতে চলুন ছোট্ট ছুটিতে

২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজ টুর
(শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি)

ওল্ড সিল্ক রুট	: ৪৫০০ টাকা
পেলিং	: ৫৫০০ টাকা
লোলেগাঁও রিশপ	: ৪৫০০ টাকা
গ্যাংটক সঙ্গে ছাঙ্গু	: ৫৫০০ টাকা
ডুয়ার্স	: ৪১০০ টাকা
দার্জিলিং	: ৪৯০০ টাকা

(খরচ জনপ্রতি)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

ক্লাব-পাঠাগার-নাটক নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বলে ‘ডিপ্রেশন’ শব্দের অর্থ জানতেন না। ১৯৩০-এর পর থেকে জলপাইগুড়ি শহর তুঙ্গতম বিন্দুতে পৌঁছোচ্ছিল। তার সঙ্গে তাল রেখে দিনবাজারের আয়তন বেড়েছে।

প্রথম দফার মারোয়ারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় কাপড়ের দোকান ছিল প্রহ্লাদ আগরওয়ালের। দিনবাজার মসজিদের পাশে বড় দোকান ছিল রামনারায়ণ হনুমানদাস আর মদনলাল আগরওয়ালের। সঙ্গে হুকাপট্টি আর দর্জির দোকান সার সার। এগুলি চালাতেন মুসলিমরা। কামার পাড়ার দিক থেকে বাজারে ঢোকার পথটা বড় বড় গাছে ছায়াময় হয়ে থাকত বলে জানা যাচ্ছে।

বার্নেশ বাজার ছিল তখন বিরাট ‘হোল সেল মার্কেট’। সে বাজার এবং পাটগ্রাম, বাকালি, হলদিবাড়ি থেকে তিস্তা-করলা হয়ে আসা মাল বোঝাই নৌকো আসত দিনবাজার কালীবাড়ির ঘাটে। নিয়েও যেত বোঝাই করে। সুতরাং দিনবাজার আড়ে-বহরে বেড়ে উঠতে সময় নেয়নি। শহর জুড়ে আরও বাজার নির্মিত হলেও দিনবাজারের গুরুত্ব মোটেই কমেনি। কিন্তু আয়তন বৃদ্ধি কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই হয়েছে। নিয়ম-নীতি মানার ব্যাপারেও অনেক উদাসীনতা থাকায় বাজারের পরিবেশ ক্রমশঃ বিপদজনক হয়েছে। এই বিপদটা আগুন লাগার।

দিনবাজারের ইতিহাসে আগুন একাধিকবার লেগেছে। ১৯২০ সালেও বাজার পুরোটাই প্রায় পুড়ে যায় আগুন লেগে। সেবার অবশ্য কালীবাড়ির কোনও ক্ষতি হয়নি। ২০১৫-এর মাঝামাঝি ভয়াবহ আরেকটি অগ্নিকাণ্ডে টিনশেড এলাকাটি ছাই হয়ে যায়। বহুকাল ধরে এই টিনশেড নিয়েই সকলে আতঙ্কে থাকতেন। সে আতঙ্কের আপাততঃ ইতি, কারণ টিনশেড অঞ্চলটি এখনও ফাঁকা। সেখানে পাকাপোক্ত বাজার তৈরি হবে। এই লেখা পর্যন্ত সেটা পোড়ো জমি।

টিনশেড বাদ দিলে বাকি বাজারের মূল সমস্যা যখন সেখানে করলার জল ঢোকে। নদী ঘেঁসেই মাছ বাজার। সে বাজার যেমন বর্ষায় ডোবে তেমনই সে বাজার থেকে নিক্ষিপ্ত বর্জ্য করলার শ্বাসরোধ করে। বস্তুতঃ, করলা নদী দূষিত করার ক্ষেত্রে দিনবাজারের অনেক অবদান। এই সমস্যাটা নিয়ে ভাবা হলেও ফল কিছু ফলেনি। টিনশেডে পাকাপোক্ত বাজার চালু হতে সময় লাগবে। অবশিষ্ট বাজারে আগুন লাগতে পারে যখন তখন।

২০১৫ সালের ৭ই মে ক্রেতা-বিক্রেতা- প্রশাসনের বহুদিনের আশঙ্কাকে সম্মান জানাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দিনবাজারের টিনশেড। ঘটনাটা ঘটেছিল রাতে। ১৯২০ সালের দহনের পর এটাই ছিল বিরাট ধরনের পুড়ে যাওয়া। বাজারের বাকি অংশ কপালজোরে সে আগুনের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বড় আগুন লাগাটা সব সময় বিপদজনক। প্রশাসন ও পুরসভা দ্রুত ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে আপদকালীন সাহায্য হিসেবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় টিনশেড এলাকায় স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করবে সরকার। কিন্তু ঘটনার এক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর আর কিছু না হওয়ায় ২০১৬-র ৭ই মে, দহনের বর্ষপূর্তিতে ব্যবসায়ীরা কালো ব্যাচ পরে ধিক্কার দিবস পালন করেন।

এসজেডিএ-র মাধ্যমে বাজারে স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির জন্য সরকার আবার নড়েচড়ে বসে। ১২ কোটি টাকা মঞ্জুর হয় স্থায়ী পরিকাঠামোর নির্মাণে। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে দেবু চৌধুরী জানিয়েছেন যে, তাঁরা এই পরিকাঠামো নির্মাণের কোনও টাকা দেবেন না। পরিকাঠামো পুরোপুরি সরকারের দায়িত্ব। অতঃপর নোট বাতিল। সব আবার থমকে গেল। অবেশেষে অতি সম্প্রতি দেখা গিয়েছে এসজেডিএ-কে নড়েনড়ে বসতে। জুলাই মাসের ২৭ তারিখে তিনি পরিকাঠামোর প্রথম শিলাটি ন্যাস করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই ঘটনায় বাজারে খুশির পরিবেশ। তবে যাদের ঘর পোড়ে তাঁরা সহজে নিশ্চিত হতে পারেন না। প্রথম শিলা আর দ্বিতীয় শিলার মধ্যে ব্যবধান কী ভাবে বেড়ে যায় — সেটা জানেন তাঁরা।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, দিনবাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে করলা দূষণের প্রসঙ্গটি জড়িত। মাছ বাজারের থার্মোকলের বাক্স নদীতে নিক্ষেপ করা বন্ধ করার পাশাপাশি বাজারের ময়লার নদীমুখী হওয়া থামান আবশ্যিক।

শত বছরের বেশি দিন ধরে দিনবাজার চলছে। চলবেও। জলে-কাদায়-ময়লায় মাখামাখি হয়ে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ক্রেতা-ব্যাপারি চালিয়ে যাবেন বাজার। বাজারের পরিবেশটা সুখের হলে সকলেরই মঙ্গল। সরকারের কথা সত্যি হলে দিনবাজারের সুখের দিন সমাগত। আমরাও চাই না টিনশেডে স্থায়ী পরিকাঠামোর শিলান্যাসের শতবর্ষ নিয়ে কোনও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে।

দিনবাজারের ব্যবসার ইতিহাস যদি ভবিষ্যতে কেউ উদ্ধার করতে পারেন তবে তা ডুয়ার্স এবং পাহাড়ের বহু পুরনো অর্থনৈতিক আদানপ্রদান ও পারস্পরিক নির্ভরতার বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হবে।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

(ফোটো এবং সহ প্রতিবেদন: দুর্বাদল মজুমদার)

অরণ্য মিত্র

দীননাথের রিসর্টে কী হচ্ছে তা জানাচ্ছে না দেবমালা। উৎকণ্ঠায় থাকা কনক দত্ত আর দেরি করতে চাইলেন না, গাড়ি ছোটালেন রিসর্টের দিকে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাবার আগেই থেমে যেতে হল তাঁদের। রিসর্টের ভিতরে তখন গুলির যুদ্ধ। ধূম্রজাল তৈরি করে বোসবাবুর আক্রমণের হাত থেকে কি নিস্তার পেতে পারবে দাসবাবু এবং তাঁর কোম্পানি? উত্তেজনার বশে চরম ভুল করে ফেলল রাজা রায়। সুরেশ কুমার কভার ফায়ার শুরু করেছে। মায়াঙ্ক বুঝল, এটাই সুযোগ গাড়ির কাছে পৌঁছানোর। তারপর একসময় সব শান্ত। ঝুঁকি নিয়ে রিসর্টের ভিতরে পা রেখে কনক দত্ত দেখলেন পড়ে থাকা দেহ। দেবমালার?

১০৯

কনক দত্ত বললেন, 'আধ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে দেবমালার একটা ফোন না আসার কোনও কারণ নেই। আমার মনে হয়, শি ইজ ইন ট্রাব্‌ল।'

রিসর্ট থেকে যে রাস্তাটা লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে ব্রিজের দিকে চলে গিয়েছে, তার মোড়টায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখার ছলে অপেক্ষা করছিলেন ওঁরা দু'জন। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর। হালকা জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছে রাস্তাটা। বাঁ দিকে বেশ খানিকটা নিচে নদীর খাত। জলের ধারাটা রাস্তা ঘেঁষে যাওয়ায় অবিশ্রান্ত ছলছল শব্দ শোনা যাচ্ছিল। হালকা মেঘের ফাঁক দিয়ে ঠিকরে বার হচ্ছিল জ্যোৎস্না। সব মিলিয়ে একটা মায়াময়-ছায়াময় পরিবেশ।

'ওদিকে যাবেন বলছেন?' পরি ঘোষাল জিজ্ঞেস করলেন।

'গাড়িতে উঠুন।' কনক দত্ত দরজা খুলে চালকের আসনে বসতে বসতে জানালেন, 'রিসর্টে জায়গা পেল কি পেল না, সেটা জানাতে এত সময় লাগার কথা নয়।'

'হয়ত কাউকে ডেকে পাচ্ছে না।'

'সেটা হলেও ফোন আসত। ইনফর্মেশন না আসাটা সন্দেহজনক।'

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটু জোরেই ছোটালেন কনক দত্ত। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেদের রিসর্ট ছাড়িয়ে দীননাথের রিসর্টে যাওয়ার মোড়টার সামনে এসে পড়লেন তাঁরা। গতি কমিয়ে ডান দিকে বাঁক নিতে নিতে বললেন, 'এটা কিন্তু হাতির করিডর। কিছু চোখে পড়লে চুপ করে থাকবেন।'

ধীরেসুস্থে গাড়ি চালিয়ে গেলে বড়জোর মিনিট পাঁচেক লাগবে দীননাথের রিসর্টে। গুগ্‌ল ম্যাপ দেখে এটাই মনে হয়েছিল কনক দত্তর। রিসর্টের আগে একটা টার্ন আছে রাস্তায়। কনক দত্ত রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। হাতিরা নিঃশব্দে আসে, কিন্তু একবার সুযোগ দেয়। বাঁকটার সামনে এসে গাড়ির গতি আরও একটু কমিয়ে দিতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু পরপর কয়েকটা শব্দ তাঁকে বাধ্য করল ব্রেক চেপে ধরতে।

গুলির আওয়াজ!

'মাই গড! ফায়ারিং!' কনক দত্তর মুখ থেকে কথাটা পুরো বার হওয়ার আগেই আবার ভেসে এল সেই শব্দ। টানা কয়েক সেকেন্ড। ডান দিকে গাছগাছালির ফাঁকে মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গা অনুমান করে দ্রুত হাতে স্টিয়ারিং ঘোরালেন তিনি। দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ার আগে চাপা স্বরে পরি ঘোষালকে নির্দেশ দিলেন, 'মাটিতে শুয়ে পড়ুন!'

পরি ঘোষাল হাঁকুপাঁকু করে নামতে গিয়ে একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়লেন মাটিতে। থেমে থেমে গুলির আওয়াজ আসছে রিসর্টের ভিতর থেকে। চিৎ দশা থেকে উপুড় হয়ে পরি ঘোষাল বললেন, 'এ তো মশাই যুদ্ধ হচ্ছে! করছে কারা?'

'বলা মুশকিল।' পকেট থেকে অস্ত্রটা বার করে সামনে তাক করে কনক দত্ত বুকে হেঁটে এগতে লাগলেন। 'তবে গুলি সম্ভবত চলছে রিসর্টের ভিতরে। আরেকটু না এগলে ব্যাপারটা

বোঝা যাবে না।'

পুলিশি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কনক দত্ত অনুমান করেছিলেন যে, উচ্চমানের অটোমেটিক বন্দুক থেকে গুলি চলছে সামনে কোথাও। অন্য বন্দুকও থাকা বিচিত্র নয়। তিন-চার ধরনের শব্দ কানে আসছিল তাঁর। দুটো গ্যাং-এর লড়াই হলে যেমন হয়। থেমে থেমে গুলির শব্দ হচ্ছে মানে দু'পক্ষই পজিশন নিতে পেরেছে।

খানিকটা এগতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে রিসর্টের গেটটা চোখে পড়ল কনক দত্তর। বাইরেটা ফাঁকা। এবার আর কোনও সন্দেহ নেই যে, গুলি চলছে ভিতরে। কিন্তু দেবমালা কি রিসর্টের ভিতরে? তাঁর গাড়িটা চোখে পড়ছে না। যদি ফিরে না গিয়ে থাকে, তবে সেটা ভিতরে থাকাটাই দস্তুর। আর ফিরে এলে সে ফোন করত নির্ঘাত।

কিন্তু ভিতরে থাকা মানে সে পড়েছে গুলির লড়াইয়ের মধ্যে। তার কাছে পিস্তল আছে। কিন্তু ভিতরের লড়াইটা যে তার সঙ্গে শুক্লা দাসের দলের হচ্ছে না, সেটা নিশ্চিত।

'হচ্ছেটা কি ভিতরে?' বিড়বিড় করে প্রশ্নটা করল মাটিতে নাক ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে থাকা পরি ঘোষাল।

বারান্দার কাছে আসতেই সুরেশ কুমার তাকে ইঙ্গিতে বাগানের দিকটা দেখিয়ে ভিতরে ছুটল স্মোক বম্ব আনতে। ধোঁয়ার আড়ালে থেকে গাড়ির দিকে দৌড়াতে হবে তাদের। লড়াইটা বেশ অসমান। বিপক্ষের অত্যাধুনিক রাইফেলের কাছে তাদের গ্লক বেশিক্ষণ টিকবে না। রাজা রায়ের ইনসাস বড়জোর আরও একটু আটকে দেবে ওদের।

১১০

গুলির শব্দে ঘুম ভাঙতেই বিপদ টের পেয়েছিল রাজা রায়। সোফার উপর রাখা ইনসাস রাইফেলটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে মোটেই দেরি হয়নি তার। বারান্দার কাছে আসতেই সুরেশ কুমার তাকে ইঙ্গিতে বাগানের দিকটা দেখিয়ে ভিতরে ছুটল স্মোক বম্ব আনতে। ধোঁয়ার আড়ালে থেকে গাড়ির দিকে দৌড়াতে হবে তাদের। লড়াইটা বেশ অসমান। বিপক্ষের অত্যাধুনিক রাইফেলের কাছে তাদের গ্লক বেশিক্ষণ টিকবে না। রাজা রায়ের ইনসাস বড়জোর আরও একটু আটকে দেবে ওদের। অতএব পালিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ এবং সেটা একটু ঝুঁকির। গাড়ির কাছে যেতে হলে খানিকটা জায়গা বিপক্ষের গুলির আওতায় সরাসরি পড়বে। ধোঁয়ার আড়াল থাকলেও আন্দাজ করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাবে ওরা। বাংলোর দেয়াল আর গাছপালাকে ঠিকমতো কাজে না লাগিয়ে দৌড়ালে এটাই হয়ত শেষ দৌড় হবে তাদের।

ওপাশ থেকে গুলি আসতেই রাজা রায় বারান্দা থেকে নামতে চাইল। দাসবাবু চাপা স্বরে বললেন, 'নো!'

রাজা রায় থমকে যেতেই কয়েকটা বুলেট তার শরীর ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে বাংলোর দেয়ালে ফুটো বানিয়ে দিল পরপর। পলকে মাটিতে শুয়ে পড়ে ইনসাসের ট্রিগারে একটা চাপ দিতেই পরপর তিনটে বুলেট বার হল। ওপাশ থেকে জবাব এল না।

'স্মোক না হওয়া পর্যন্ত উঠো না।' কয়েক হাত দূরে দাঁড়ানো দাসবাবু বললেন। রাজা রায় তখন স্থির চোখে সামনের জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার কারণে চাঁদের আলো কয়েক ধাপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। রাজা রায়ের মনে হল, একটা ছায়ামূর্তি খুব ধীরে সরে যাচ্ছে গাছপালার আড়ালে। শরীরটা একটু তুলে গুলি ছুড়তে চাইল রাজা রায়। দাসবাবু দেখলেন, রাজা রায় কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলছে। তিনি তীক্ষ্ণ অথচ চাপা সুরে বললেন, 'ডোন্ট ডোন্ট!'

কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে। একটাই বুলেট ছিটকে এল ওদিক থেকে। রাজা রায়ের মাথাটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। মাথার পিছন থেকে রক্তের একটা ধারা বেরিয়ে ভিজিয়ে দিল তাঁর কান।

'শুয়োরের বাচ্চা!' হতাশ দাসবাবু বারান্দায় জোরে ঠুকলেন নিজের পা। সুরেশ কুমার স্মোক বম্ব নিয়ে ফিরে আসছিল। ঘটনাটা দেখে থমকে গেল সে। তাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন দাসবাবু।

'এই লাইটে রাজাকে যেভাবে নিখুঁত মারল, তাতে মনে হচ্ছে, ওদের হাতে ইনফ্রারেড ভিউ ফাইন্ডার লাগানো আর্মস আছে।'

'কে হতে পারে?' সুরেশ কুমারের স্বরে উদ্বেগ ধরা পড়ল, 'দিল্লির লোকেরা কি বুদ্ধ ব্যানার্জির টিমকে অ্যাটাক করবে?'

'সেটা পরে ভাবব।' দাসবাবু নির্বিকার সুরে জবাব দিলেন, 'তুমি স্মোক বম্বটা চার্জ করার পর ওরা হেভি ফায়ারিং করবে। এখান থেকে নড়া যাবে না। তারপর একবার থামবে। আমি তখন এদিক থেকে কভার করব। তোমার কাজ রাজার ইনসাসটা তুলে নিয়ে সোজা গাড়ির দিকে দৌড়ানো। তারপর ওদিক থেকে তুমি কভার দিতে শুরু করলে আমি যাব।'

'কিন্তু বাকিরা কোথায়?'

'সেটা জরুরি নয়। দুটো গাড়িতেই চাবি লাগানো আছে। দু'জনে দুটো নিয়ে বেরিয়ে যাব। বাকিদের দায়িত্ব গাড়িতে তার আগে উঠে পড়ার। না পারলে কিছু করার নেই। পরিস্থিতি আদৌ ভাল নয়।'

'ঠিক।' সুরেশ কুমার পকেট থেকে লাইটার বার করে দণ্ডাকৃতি বোমের পলতেয় আগুন লাগাল। পলতে পুড়ে আগুন বারুদে লেগে ধোঁয়ার সৃষ্টি শুরু করতেই বোমাটাকে সে ছুড়ে দিল সামনের দিকে। ঘন সাদা ধোঁয়া পাক খেয়ে জমে উঠতেই দাসবাবুর অনুমানকে সত্যি প্রমাণ করে ওপাশ থেকে শুরু হল টানা গুলিবর্ষণ। বারান্দার পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা বাংলোর ঘরের দেয়াল থেকে শুরু করে আশপাশের গাছপালা, ফুলের কেয়ারির উপর আছড়ে পড়া বুলেট লক্ষ করে দাসবাবু বুঝলেন, ধোঁয়ার ধাক্কায় দিশেহারা হয়ে বিপক্ষ এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ছে। তিনি সুরেশ কুমারকে ইঙ্গিতে রাজা রায়ের মৃতদেহের সামনে পড়ে থাকা ইনসাসটা দেখালেন।

সুরেশ কুমারের শরীর কতটা ফিট—এবার তা বোঝা গেল। লাফিয়ে ইনসাসটা তুলে নিয়ে একটা ডিগবাজি খেয়ে খানিকটা দূরে চলে গেল সে। তারপর মাথা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি এনে দৌড় দিল বাংলোর দেয়াল ঘেঁষে। দাসবাবু তাঁর গ্লক থেকে ফায়ার শুরু করলেন জঙ্গলের দিকে তাক করে। ওদিক থেকে গুলি ছুটে আসা থেমে গেল।

সিমেন্টের বেঞ্চের আড়াল থেকে মায়াঙ্ক লক্ষ করল ধোঁয়া বোমা আর সুরেশ কুমারের দৌড়। পাশে কাঠের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে মনামি। তার কাঁধে চাপ দিয়ে মায়াঙ্ক ফিসফিস করে বলল, 'গেট আপ মনামি! গাড়ির দিকে দৌড়াও!'

মনামির বুকের ভিতর হাতুড়ি পড়ছিল। সে ঘাড় তুলে বিস্ফারিত চোখে তাকাল মায়াঙ্কের দিকে।

'আমি তিন গুনছি। ঘরগুলো ঘেঁষে মাথা নিচু করে দৌড়াবে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

জঙ্গলের দিকটা ঘন ধোঁয়ার আড়ালে। এই মুহূর্তে কোনও গুলির শব্দ নেই। মনামি উঠে বসল। মায়াঙ্ক ততক্ষণে গুনতে শুনেছে। 'থ্রি' শব্দটা শোনামাত্রই মনামি পাগলের মতো মাথা নিচু করে দৌড়াল ছোট বাড়িগুলোর দিকে। পলকের জন্য দেখল, গাড়ির সামনে সুরেশ কুমার পৌঁছে গিয়েছে। এবার জঙ্গল তাক করে ইনসাস থেকে ফটফট করে গুলি ছুড়তে শুরু করল সে।

পালটা জবাব এল ধোঁয়ার ওপাশ থেকে। ছোট বাড়িগুলোর পিছন দিয়ে গাড়ির দিকে চলে যাওয়ার জন্য গতি বাড়াল মনামি। মায়াঙ্ককে দেখা যাচ্ছিল না তখন। কিন্তু তার গলা শুনছিল মনামি। মায়াঙ্ক বলে যাচ্ছিল, ‘গো গো! রান!’

গুলির ধাক্কায় সামনে থাকা কদম গাছটায় একটা ঝাঁকানি খেলে গেল। একটা ডাল ভেঙে পড়ল তার ঠিক সামনে। থতমত খেয়ে থমকে গেল মনামি।

‘মু-উ-উ-ভ!’

মনামিকে থেমে যেতে দেখে চিৎকার করল সুরেশ কুমার। ইনসাসের ট্রিগার চেপে রেখে কভার করতে চাইল তাকে। গাড়ির দিকে দৌড়ে যাওয়া দাসবাবু ছুটন্ত অবস্থায় গুলি ছুড়তে লাগলেন রিসর্টের পিছনে, ধোঁয়ার ওপারে থাকা শত্রুর দিকে।

১১১

টানা কয়েক মিনিট প্রচণ্ড গুলির আওয়াজ শোনার পর কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। কনক দত্তর কানে গাড়ি স্টার্ট হওয়ার শব্দ এল তারপর। সঙ্গে সঙ্গে আবার গুলির শব্দ শুনলেন তিনি। রিসর্টের গেটটা সশব্দে ছিটকে খুলে যেতেই দুটো গাড়ি হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। বোঝা গেল যে, প্রথম গাড়িটা ধাক্কা দিয়ে গেটটা খুলে দিয়েছে। দুটো গাড়িই বিপজ্জনক গতিতে ছুটল বড় রাস্তার দিকে। তাদের ইঞ্জিনের শব্দ দেখতে দেখতে ক্ষীণ হয়ে গেল। এবার রিসর্টের খোলা গেটের ওপার থেকে ছুটে বেরিয়ে এল দু’টি মানুষ। দু’জনের হাতেই অস্ত্র। তার মধ্যে একটি অস্ত্র দূর থেকে দেখে কনক দত্ত বিড়বিড় করে বললেন, ‘এ জিনিস দেশের আর্মির হাতেও নেই ঘোষালবাবু!’

‘আরেকটার হাতে বোধহয় পিস্তল?’ পরি ঘোষাল শুকনো গলায় বললেন।

‘সেটাও কম যায় না। আমার ইছাপুর মেড রিভলভার এসবের কাছে খেলনা।’

‘ওরা কিন্তু আর এগচ্ছে না!’

দু’জন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, গাড়ি দুটোকে তাড়া করাটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মিনিটকয়েক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার ভিতরে চলে গেল দু’জন। গেটটা টেনে দিল ভিতর থেকে। চারদিকে এখন অখণ্ড নৈঃস্তব্ধ্য। গুলির শব্দ একেবারে থেমে যাওয়ার কারণে অরণ্যের নৈশ নীরবতা আবার জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে চারদিকে।

‘ভিতর থেকে ঘন ধোঁয়া উঠছে না?’ পরি ঘোষাল বললেন, ‘কুয়াশা নাকি?’

‘মনে হচ্ছে, স্মোক ক্রিয়েট করে পালিয়েছে গাড়িওয়ালারা। স্মোক বম্ব হতে পারে।’

‘পালাল কারা? শুক্লা দাসের টিম?’

‘বলা মুশকিল। দেবমালাকে খুঁজতে হবে।’

‘ভিতরে ঢুকবেন?’

‘এখনই নয়।’ কনক দত্ত উত্তর দিলেন, ‘ওরা গেট অব্দি ধাওয়া করে ফিরে গেল। তার মানে ওদের কাছে গাড়ি নেই। হতে পারে, ওরাই হামলা করেছিল রিসর্টে। সম্ভবত পিছন দিক থেকে।’

‘পলায়নকারীরা তবে শুক্লা দাসের টিম!’ পরি ঘোষাল মন্তব্য করলেন।

‘তা-ই যদি হয়, তবে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে একটা রিস্ক নিতে হবে।’ কনক দত্ত ভাবিত গলায় জানালেন, ‘হামলাকারীরা পিছন দিক থেকে এলে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। কারণ গুলির শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছে। পুলিশ আসার একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। মনে হয় না, রিসর্টে এর পর থেকে যাওয়ার রিস্কটা কেউ নেবে।’

ওঁরা দু’জন আরও আধ ঘণ্টা মাটিতে শুয়ে রিসর্টের দিকে নজর রাখলেন। কিন্তু সেদিক থেকে আর কোনও শব্দ ভেসে এল না। চাঁদের আলোয় শান্ত হয়ে থাকল চারপাশ— যেন কিছুই ঘটেনি। গুলির শব্দে চুপ হয়ে যাওয়া ঝিঁঝিপোকার বাহিনী আবার আলাপ শুরু করে দিল। এদিক-ওদিক থেকে ছিটকে আসতে লাগল বিচিত্র শব্দের টুকরো। রাতের জঙ্গল আবার ছন্দে ফিরছিল যেন।

আরও মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পর কনক দত্ত উঠে বসলেন। পরি ঘোষালের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ‘এবার যাওয়া যেতে পারে। আপনি ইচ্ছে করলে এখানে অপেক্ষা করতে পারেন।’

‘নো স্যার!’ পরি ঘোষাল সোজা হলেন— ‘এক যাত্রায় পৃথক ফলের দরকার নেই। চলুন!’

সন্তর্পণে গাছপালা ঘেরা এলাকাটা দিয়ে সামনের দিকে এগতে লাগলেন দু’জনে। রিসর্টের কাছাকাছি আসার পর খোলা গেটের ওপাশটা নজরে এল। পাথর বিছানো সরু রাস্তাটা চোখে পড়ল তাঁদের। ভিতরে কোথাও জোরালো আলো জ্বলছে একটা। কিন্তু লোকজনের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না।

রিভলভারটা শক্ত করে ধরে গেটের ভিতরে ঢুকে পড়লেন কনক দত্ত। ঢুকতেই বাঁ দিকে রাখা দেবমালার গাড়িটা চোখে পড়ল তাঁর। দৌড়ে গিয়ে সে গাড়ির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। পরি ঘোষাল নিঃশব্দে তাঁকে অনুকরণ করল।

‘দেবমালার গাড়ি এটা! তার মানে সে ভিতরে ঢুকেছিল।’

‘এখনও কি ভিতরে আছে?’

‘বুঝতে পারছি না।’ পরি ঘোষালের প্রশ্নের জবাবে বললেন কনক দত্ত, ‘সামনের দিকে তাকান ভাল করে, ওই বেঞ্চিটার

রিভলভারটা শক্ত করে ধরে গেটের ভিতরে ঢুকে পড়লেন কনক দত্ত। ঢুকতেই বাঁ দিকে রাখা দেবমালার গাড়িটা চোখে পড়ল তাঁর। দৌড়ে গিয়ে সে গাড়ির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। পরি ঘোষাল নিঃশব্দে তাঁকে অনুকরণ করল। ‘দেবমালার গাড়ি এটা! তার মানে সে ভিতরে ঢুকেছিল।’
‘এখনও কি ভিতরে আছে?’
‘বুঝতে পারছি না।’
পরি ঘোষালের প্রশ্নের জবাবে বললেন কনক দত্ত, ‘সামনের দিকে তাকান ভাল করে, ওই বেঞ্চিটার কাছে।

কাছে। কিছু চোখে পড়ছে?’

পরি ঘোষাল দেখার চেষ্টা করলেন। খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না দেখতে। একটা মানুষ পড়ে আছে।

‘কেউ পড়ে আছে!’ পরি ঘোষালের গলায় মৃদু উত্তেজনা, ‘মরে গিয়েছে মনে হচ্ছে!’

কনক দত্ত কোনও কথা না বলে গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের পিছনে দাঁড়ালেন। পাথরের রাস্তাটা দু’ভাগে ভাগ হয়ে দু’দিকে চলে গিয়েছে। বাঁ দিকে একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির অংশ চোখে পড়ছে এখন। তার সামনে জোরালো আলো জ্বলছে একটা। সেই আলো আর চাঁদের আলো মিলেমিশে সামনে পড়ে থাকা দেহটাকে আরও খানিকটা স্পষ্ট করে তুলেছে। চেনা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে যে দেহটা একটা মেয়ের!

‘মাই গড!’ কনক দত্তর পিছনে এসে দাঁড়ানো পরি ঘোষালের চাপা স্বর শোনা গেল, ‘দেবমালা নয় তো?’

‘আপনি এখানে দাঁড়ান!’ কনক দত্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘আমি কাছে গিয়ে দেখছি।’

পরি ঘোষাল দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কনক দত্ত এগচ্ছেন। পড়ে থাকা দেহটার পরিচয় এক্ষুনি জানা যাবে। কিন্তু এটা কি কোনও ফাঁদ?

(ক্রমশ)

ডুয়ার্স থেকে শুরু

কেবল হি কেবলম্

ভূতের ভবিষ্যৎ সবসময় যে ভূতুড়েই হবে, এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু গলা-জল অবধি অতীত গৌরবে ডুবে থাকলে অনেক সিদ্ধান্ত, নির্ঘাত অবশ্যম্ভাবীকে অস্বীকার করবার একচোখামিতে দুষ্ট হয়ে পড়ে। মা কী ছিলেন, আর মা কী হইয়াছেন? প্রথম যখন ভারত জুড়ে কেব্‌ল টেলিভিশন জাল ছড়ানো শুরু করল, সেই সময় উত্তরবাংলার ছোট শহরে কীসে হোঁচট খেয়ে একটা বড় স্বপ্ন থেমে গেল? আর স্বপ্নটার অপমৃত্যু সত্ত্বেও, সময়কে কি থামিয়ে রাখা গেল শেষটায়? উত্তরবঙ্গকে ঘিরে বাঁচতে চাওয়া একদল তরুণ শেষে কেন জীবিকার দরকারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল বাইরের দুনিয়ায়, তার অন্যতম একটি কারণকে ফিরে দেখা, আজকের পর্বে।

—দাদা, আমি সিসিএন-এর অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

ফোনের ওপার থেকে একটা পিনপিনে গলা কথা বলে উঠল। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি তখন এক প্রকাণ্ড জনসমুদ্রের মুখোমুখি। বোধহয় কোনও রাজনৈতিক জমায়েত আছে আজকে। মেঘলা আকাশের নিচে শয়ে শয়ে মানুষ কিলবিল করছে, যত দূর চোখ যায়। একদিকে তাদের কলরব। আরেকদিকে রাস্তার গাড়িগুলো জনসমুদ্রে আটকে পড়ে 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে' ভঙ্গিতে মরিয়াভাবে হর্ন বাজিয়ে চলেছে। চূড়ান্ত উচ্চগ্রামের সেই সমবেত ডেসিবেলের দয়ায় ফোনের কথা শোনে কার সাধ্য। তার উপর আবার এরকম পিনপিনে গলা।

আমার নিজের গলাটা চারতলা বিল্ডিং-এর সমান উঁচু করে বললাম, কে বলছেন? একটু জোরে বলুন।

তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে, পিনপিনে গলাটি মোটামুটি সাড়ে তিনতলা উঁচুতে চড়ল।

—আমি এয়ারটেল থেকে বলছি। শিলিগুড়িতে আপনাদের লিজ লাইনের ফিজিবিলিটি চেক করার ছিল।

আমার মনে পড়ে গেল। অফিস থেকে একটা হাই স্পিড ইন্টারনেট লাইনের প্রোপোজাল চাওয়া হয়েছিল বটে দু'-তিনটি টেলিকম কোম্পানির কাছে।

—ও, আচ্ছা আচ্ছা...। তো বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আপনি ভিতরে চলে যান।

—ভিতরে ঢুকতে দিলে তো ! সেই জন্যেই তো ফোন করছি। বলছে, কলকাতা থেকে নাকি ওদের কেউ কিছু জানায়নি।

আপনি একটু কথা বলে সমস্যাটা মেটান।

—সে কী! এমন হওয়ার তো কথা নয়। দাঁড়ান, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

এই ফোনটা কেটে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার আরেক ফোনে ডায়াল করতে হল। চারদিকের হট্টগোল ততক্ষণে আরও কয়েক পরদা চড়া হয়ে গিয়েছে। কারণ এবার মিটিং স্থল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে মাইকের হাঁকডাক। যতসব বিতিকিচ্ছিরি আউটডোর সিচুয়েশনে এইসব জটিল সমস্যাসূচক ফোন কপালে জোটে। সবসময় দেখেছি, শুনতে এবং বলতে যখন সবচেয়ে বেশি অসুবিধা, তখনই যেন জরুরি ফোন কলের ধুম পড়ে যায়। এয়ারটেলের এই কর্মীটি ফোন করছে শিলিগুড়ি থেকে। হাকিমপাড়ায়, উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ কেব্‌ল অপারেটরের অফিসে সে আজ টেকনিক্যাল ফিজিবিলিটি পরীক্ষা করে দেখবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, তারপরে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি অবধি ছ'শো কিলোমিটার ফাইবার কেব্‌ল পথে, কলকাতা থেকে প্রচারিত আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলটি গিয়ে পৌঁছাবে উত্তরবঙ্গে। গোটা ব্যাপারটা বেশ কয়েক মাসের ধাক্কা। চ্যানেলের পক্ষ থেকে যিনি কেব্‌ল অপারেটরদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখেন, আমি তাঁকে ফোন করে সমস্যাটা জানালাম। মাইকের সঙ্গে পাল্লা দিতে, যথারীতি একপ্রস্থ খুব জোর চেঁচামেচি করতে হল। প্রতিটি বাক্য দু'বার দু'বার করে বলার পরে অবশেষে বিষয়টি বোঝানো গেল তাঁকে। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, সিসিএন-এর অফিসে ফোন করে অনুমতির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সিসিএন এখন উত্তরবঙ্গের ঘরে ঘরে। আর সেটা ভাবলেই আমার মনে পড়ে যায় প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। যখন জলপাইগুড়িতে ঠিক এরকমই একটি কেব্‌ল নেটওয়ার্ক তৈরির আকাঙ্ক্ষায় মেতে উঠেছিলাম আমরা কলেজের কিছু নিকট বন্ধু। তারও বছর পাঁচ আগে থেকে, ভিডিয়ো ক্যাসেট জিনিসটি নিয়ে একটা প্রবল মাতামাতি চলছিল সারা শহরে। পাড়ায় পাড়ায় তখন ছোট ছোট ভিডিয়ো হলের ছড়াছড়ি। যাদের বাড়িতে কালার টিভি এবং ভিডিয়ো ক্যাসেট প্লেয়ার দুটোই আছে, লোকের চোখে তাদের বিরাট স্টেটাস। আর বাকি আম জনতার ভরসা ভাড়ার টিভি ও ভিসিপি।

সে সুবাদে শহরের আনাচকানাচে ভিডিয়ো ক্যাসেট লাইব্রেরি খুলে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল বহু মানুষ। কারেন্ট সিনেমা, যেগুলো আগে ছ'মাস কি এক বছরের আগে সিনেমা হলে আসত না, ক্যাসেটের কল্যাণে তা তখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল রিলিজ হওয়ার এক-দু' সপ্তাহের মধ্যেই। আসলে পাইরেসির ভাইরাস তখন সারা ভারতে ধুন্ধুমার দাপট দেখাচ্ছে! সিনেমা জগৎ জুড়ে গেল গেল রব। কারণ ভাইরাসের মূল রাশটি ধরা ছিল দুবাইয়ের 'ভাই'দের হাতে, যাদের ঠেকানো ঈশ্বরের অসাধ্য কাজ!

আমাদের ছোট শহরে তখন অবশ্য দুবাইয়ের চেয়ে শারজা বেশি পরিচিত, ওয়ান ডে ক্রিকেটের কল্যাণে। চেতন শর্মার শেষ বলে জাভেদ মিয়াদাদের ছক্কার ব্যথা তখনও অনেকেরই বুকে দীর্ঘশ্বাস জাগায়। সেরকম একটা সময়, রেসকোর্স পাড়ার এক ভিডিয়ো লাইব্রেরির মালিক শহরের ওই অঞ্চলটায় জলপাইগুড়ির প্রথম কেব্‌ল টিভি পরিষেবা চালু করে ফেলল। আর ঘটনাচক্রে সেই পাড়াতেই এক বন্ধুর বাড়িতে সেই সময় আমরা সদ্য কলেজ পাশ একদল ছেলে রোজ দুপুরে আড্ডা মারতে জড়ো হতাম। নিজস্ব টিভি এবং ভিসিপি, দুটোই ছিল সেই বন্ধুর ঘরে। ছিল কয়েকশো ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ক্যাসেট। ফলে, বাইরের বিরাট দুনিয়ার দিকে উঁকি মারার একটা জরুরি জানালা ছিল সেই আড্ডাঘর। আর এবারে, সেখানে কেব্‌ল কানেকশনও চলে এল। যদিও তখন শুধু এম টিভি এবং জি টিভি, মাত্র দুটো চ্যানেলই দেখা যেত। কিন্তু তা দেখতে পেয়েই আমাদের প্রায় বর্তে যাওয়ার দশা।

ঝকমকে এই এন্টারটেনমেন্ট এনজয় করে করেই হয়ত দিন কেটে যেত। যদি না হঠাৎ একদিন তৃতীয় একটি চ্যানেল এসে আবির্ভূত হত। একদিন দুপুরে দেখা গেল, সম্পূর্ণ নামহীন একটি চ্যানেল নতুন রিলিজ হওয়া হিন্দি সিনেমা দেখাচ্ছে। আমাদের বন্ধুটির ভুরু কুঁচকে গেল সেই ছবি দেখে। সে বলল, এ তো দেখে মনে হচ্ছে, ভিডিয়ো ক্যাসেট চলছে। ছবির কোয়ালিটি লক্ষ করে দেখ!

বন্ধুটির প্রচুর ভিডিয়ো দেখার অভিজ্ঞতা। ফলে তার চোখে ব্যাপারটা চট করে ধরা পড়ে গিয়েছে। কেব্‌ল অপারেটরের নাম নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে এর পর বলল, আমি শিয়োর, এটা ওরাই লোকালি চালাচ্ছে।

একটু খোঁজ করতেই জানা গেল যে, সত্যিই এটা কেব্‌ল অপারেটরের কীর্তি। তার তো আগে থেকেই ভিডিয়ো ক্যাসেটের ব্যবসা ছিল। সুতরাং ভিসিপি-তে ক্যাসেট চালিয়ে সেটা কেব্‌ল টিভিতে দেখাতে আলাদা কোনও হ্যাপা নেই। বরং নতুন গ্রাহক টানতে নিখরচার বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে।

পুরো ব্যাপারটা বোঝামাত্রই আমার মনে একটা আইডিয়া খেলে গেল। বন্ধুদের কাছে প্রস্তাব রাখলাম, আমরাও যদি কেব্‌লের ব্যবসায় নামি, কেমন হয়? এখনও তো বাকি শহরে কেব্‌ল চালু হয়নি। সুতরাং ব্যাপারটা থেকে উপার্জনও হবে। আর তার সঙ্গে আমরা জলপাইগুড়ির একটা নিজস্ব চ্যানেলও চালাব, যেখানে স্থানীয় প্রতিভারা সুযোগ পাবে। স্থানীয় সংবাদ, স্থানীয় ইস্যু থাকবে।

গণমাধ্যমের অভিজ্ঞতা বলতে তখন অবধি আমাদের সম্বল একটি হাতে লেখা (এবং আঁকা) ননসেন্স পত্রিকা। তার একটাই মূল কপি কলেজে হাতে হাতে ঘুরত প্রথম দিকে। সেটি ছিল ফেরতযোগ্য। পরে জেরক্স এসে গেল। তখন জেরক্স কপিও বিতরণ করা হত। দাম ছিল, মাত্র একটি চারমিনার সিগারেট। এবং আমাদের বয়সিদের মধ্যে সেই পত্রিকা এত জনপ্রিয় ছিল যে, পত্রিকার নামেই আমাদের গোষ্ঠীর পরিচয়। তো, বস্তুত সেই সাফল্যের স্বাদটাই আমাকে কেব্‌ল বা ভিডিয়ো ম্যাগাজিনের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। তবে মুখে বলতে গেলে ব্যাপারটা যতই জলের মতো সরল মনে হোক, আসলে তো সে এক সাংঘাতিক আকাশচুম্বী কল্পনা। কারণ ভিশুয়াল মিডিয়ার টেকনিক্যাল দিক সম্বন্ধে তখন অবধি

পাড়ায় পাড়ায় তখন ছোট ছোট ভিডিয়ো হলের ছড়াছড়ি। যাদের বাড়িতে কালার টিভি এবং ভিডিয়ো ক্যাসেট প্লেয়ার দুটোই আছে, লোকের চোখে তাদের বিরাট স্টেটাস। আর বাকি আম জনতার ভরসা ভাড়ার টিভি ও ভিসিপি। যে সুবাদে শহরের আনাচকানাচে ভিডিয়ো ক্যাসেট লাইব্রেরি খুলে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল বহু মানুষ। কারেন্ট সিনেমা, যেগুলো আগে ছ'মাস কি এক বছরের আগে সিনেমা হলে আসত না, ক্যাসেটের কল্যাণে তা তখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল রিলিজ হওয়ার এক-দু' সপ্তাহের মধ্যেই।

আমাদের নলেজ জিরো।

কিন্তু তবু আইডিয়াটা সবার মনে ধরে গেল। দারুণ উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল বন্ধুরা, কী করে শুরু করা যায় বল? এটা করতেই হবে!

কোথা থেকে শুরু করা যায় ভাবতে গিয়ে তখন আমারই প্রায় খেই হারিয়ে যাওয়ার দশা। একটু আমতা আমতা করে তাই বললাম, প্রথমে মনে হয় তারের ব্যাপারটা ফয়সালা করা দরকার।

—তার? কীসের তার?

—আরে, কেব্‌ল টিভি মানে কী? তারে টানা টিভি। এর তো অ্যান্টেনা বলে কিছু নেই। বাড়িতে বাড়িতে তারের কানেকশন করতে হবে।

—হ্যাঁ। তো সেটা করা হবে। অসুবিধা কীসের?

—তারটা ঝোলাবি কোথায়? ভেবে দেখ, মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্পপোস্ট ছাড়া আমাদের হাতে অপশন নেই। কিন্তু সেই পোস্ট ব্যবহার করতে গেলে আগে মিউনিসিপ্যালিটির অনুমতি নেয়া দরকার নয় কি?

সবাই ভুরু কুঁচকে ভাবতে শুরু করল। এদিকে আমাদের অতি অতিথিবৎসল বন্ধুটি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে তৎক্ষণাৎ বাড়ির রান্নাঘরে চায়ের জন্য এত্তেলা পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমাদের সেই বন্ধুদের গ্রুপের টিমওয়ার্ক ছিল অসাধারণ। এক-একজন এক-এক বিষয়ে পারদর্শী। ফলে সবাই মিলে এক হয়ে যেটাই করতে গিয়েছি তার আগে অবধি, সেটাই দুর্দান্ত সফল হয়েছে। সুতরাং এই প্ল্যানটিতেও চমৎকার অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে, সবার মধ্যে তখনই তুখড় অ্যাড্রিনালিন প্রবাহ চালু। চা এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, আমরা সরাসরি শহরের পৌরপিতার কাছে আর্জি নিয়ে হাজির হব। তাঁকে রাজি করাতে পারলেই মুশকিল আসান।

এতদিন কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে আমরা যে দলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, পুরসভা তখন তাদেরই দখলে। আর পৌরপিতাও সে দলের প্রবীণ নেতা। তাই, আমাদের সিনিয়র এক ছাত্র নেতার সূত্র ধরে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে বেশি দেরি হল না। সেই সিনিয়র দাদাটি অবশ্য কেব্‌ল টিভি নিয়ে আমরা কী ভাবতে চাইছি, সেটা ঠিক ভালভাবে বুঝতে পারল না। আমাদের বলল, ওসব আমার মাথায় ঢুকছে না। যা বলার, ওঁর সামনেই বুঝিয়ে বলিস তোরা। বুধবার ঠিক এগারোটার মধ্যে চলে আসবি মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে। ব্যাস। সেই দিনটি আসার অপেক্ষায় দিন গোনা শুরু। কী কী বলা হবে; না হবে, তা নিয়ে অজস্র জল্পনা-কল্পনা। আজকের দিন হলে অবশ্যই রাতারাতি একটি জবরদস্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানিয়ে ফেলতাম। পরবর্তীকালে জেনেছি যে, ঠিক ওইরকম বয়সেই বিল গেটস বা মার্ক জুকেরবার্গ তাঁদের ড্রিম প্রোজেক্ট নিয়ে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই বুঝেছি,

সেই দিনটি আসার অপেক্ষায় দিন গোনা শুরু। কী কী বলা হবে; না হবে, তা নিয়ে অজস্র জল্পনা-কল্পনা। আজকের দিন হলে অবশ্যই রাতারাতি একটি জবরদস্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানিয়ে ফেলতাম। পরবর্তীকালে জেনেছি যে, ঠিক ওইরকম বয়সেই বিল গেটস বা মার্ক জুকেরবার্গ তাঁদের ড্রিম প্রোজেক্ট নিয়ে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বয়সোচিত ধর্মে আমরা একদম ঠিক ভেবেছিলাম। যতই ছোট হোক আমাদের শহরের পরিধি, আমরা কিন্তু চূড়ান্ত উৎসাহী স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে, বাকি দুনিয়ার সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছিলাম, যতটা সম্ভব। তবে ড্রব্যাক ছিল একটাই। আমাদের পরিকল্পনাটি একদম নিখাদ আবেগের ফসল। তাই সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল, আমাদের যখন এত ভাল লাগছে, বিশ্বসুদ্ধ সকলেরই তাই লাগতে বাধ্য। কিন্তু মার্কেটিং-এর স্ট্র্যাটেজি বলে, সবসময় টেবিলের উলটো দিকের লোকটির মানসিকতা বুঝে নিজের সেলিং পয়েন্টগুলো বলা উচিত। একজনের কাছে যা অমৃত, আরেকজনের কাছে সেটাই হতে পারে বিষসম। যেটা আমাদের রক্ষণশীল মানসিকতার পৌরপিতার ক্ষেত্রে ঘটল।

—যথেষ্ট এডুকেটেড ছেলে তোমরা... চাকরির বদলে তাহলে ব্যবসা কেন?

তাঁর সমীপে উপস্থিত হতে, প্রথমেই তিনি গম্ভীর স্বরে এই প্রশ্ন তুললেন। আমরা প্রায় সাত-আটজন মিলে এসেছি। এতজনের বসার জায়গা মেলেনি বলে সবাই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। কে জবাব দেব বুঝতে না পেরে একে অন্যকে ঠেলতে লাগলাম। গ্রুপের মধ্যে জয়দীপ ছিল কলেজের জিএস। সব ঠেলা তাই সংহত হয়ে ওর গায়েই ঠিকানা খুঁজে নিচ্ছিল। তারই প্রভাবে ঠোঁট চেটে নিয়ে জয় বলতে শুরু করল, আসলে, সবাই মিলে এই শহরে থেকেই কিছু একটা করব ভাবছিলাম...

সিনিয়র ছাত্র নেতা দাদাটিও আমাদের সঙ্গে এসেছিল। জয়ের কথার মাঝেই সে ইন্টারাপ্ট করে তড়িঘড়ি বলল, এরা অনেক নতুন নতুন জিনিস করেছে কলেজে। নিজেদের তৈরি নাটক... গান...। কালচারালি খুবই অ্যাক্টিভ।

পৌরপিতার বিরস বদনে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। বয়সের ভারে কি না কে জানে, তাঁর সারা মুখে বিরক্তির চিরস্থায়ী অভিব্যক্তি। জোরালো আলো পড়লে হয়ত কয়লাও চিকচিক করে উঠবে। কিন্তু এঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, সারা পৃথিবীতে ক্যাপিটালিজমের সম্পূর্ণ পতন ঘটে যাক... মুখে তবু এক চিলতে হাসি ফুটবে না।

একবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, বেশ। তো কীসের ব্যবসা? আর আমার কাছেই বা তোমরা কী জন্য এলে?

—একটা পারমিশন চাই।

সময় নষ্ট না করে আমি একদম মূল পয়েন্টে চলে এলাম। কীসের জন্য

পারমিশন, সেটা বোঝাতে চলে এল কেব্‌ল টিভির প্রসঙ্গ। আর সেই শব্দটি শোনামাত্র পৌরপিতা টানটান সোজা হয়ে বসলেন।

—কী বললে? কেব্‌ল টিভি?

—হ্যাঁ... মানে, সবে শুরু হয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু যত দিন যাবে, এর ইম্পর্ট্যান্স আরও বাড়বে।

—বাড়তে দিলে তবে তো বাড়বে!

রোগাসোগা মানুষটি বাঘের মতো গর্জে উঠে আমাদের একদম থ বানিয়ে দিলেন।

—আজেবাজে সিনেমা... অশ্লীল দৃশ্য... যতসব নোংরা কাণ্ডকীর্তি! ভিডিয়ো এসে এমনিতেই তো সব উচ্ছন্নে গেল। তার উপর এখন আবার কেব্‌ল টিভি।

বাপ রে! রীতিমতো তোপ দাগার মতো সশব্দে, ধমকের পর ধমক ধেয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। ভদ্র বাড়ির ছেলে হয়ে এইসব মতলব করছ তোমরা? তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। ছি ছি, এইভাবে দেশটা রসাতলে যাবে?

বিনা দোষে আমরা হয়ে গেলাম কাঠগড়ার আসামি। পৌরপিতার কোনও আলাদা চেম্বার ছিল না তখন। একটা বিরাট হলঘরের এক প্রান্তে তাঁর টেবিল। চারপাশে অন্যান্য টেবিল এবং কাউন্টারে প্রচুর লোকজনের ভিড় সেই সময়। সুতরাং ঘরসুদ্ধ সমস্ত চোখের লক্ষ্য হয়ে পড়লাম আমরা।

প্রায় মিনিট সাতেক ধরে ক্রিস গেইলের মতো ঝোড়ো ইনিংস খেললেন পৌরপিতা। তারপর একটা বড় ছক্কা মেরে ফিফটি বা হান্ড্রেড করার ভঙ্গিতে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, আমি বেঁচে থাকতে এই শহরে ওসব অপসংস্কৃতি ঢুকতে দেব না, এটা মনে রেখো। যাও, এবার আসতে পারো তোমরা।

বোকার মতো মাথা নিচু করে সে দিন আমাদের চলে আসতে হয়েছিল। কারণ ওই অতি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সামনে যুক্তিতর্কনির্ভর পালটা কোনও বক্তব্য রাখার মতো ভাষাই ছিল না কারও কাছে। আর তা ছাড়া, দরজা বন্ধ মানে একেবারে বন্ধ। উনি আর কিছু শুনতে রাজি ছিলেন বলেও মনে হয় না।

যদিও সময়ের স্রোতকে থামিয়ে রাখা যায়নি। আজকের সারা ভারতে শুধুমাত্র কেব্‌ল নেটওয়ার্ক পরিষেবা (নামীদামি চ্যানেলগুলো বাদ দিয়েই) কয়েকশো হাজার কোটি টাকার একটা ইন্ডাস্ট্রি। বছরে একাধিকবার ভারতের বড় বড় শহরে তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেয়ার হয়, যেখানে স্বদেশ ও বিদেশের নানা টেকনোলজির বিকিকিনির হাট বসে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও আছে। এমনকি খুব ছোট কোনও শহরে গেলেও এখন দেখা যাবে, একের বেশি কেব্‌ল অপারেটর সেখানে জমিয়ে ব্যবসা করছে।

একে একে কর্মজীবনের ডাকে শহর ছাড়তে ছাড়তে বন্ধুদের সেই গ্রুপটা ছড়িয়ে গেল ভারতের নানা প্রান্তে। এত বছরে স্বপ্ন সবারই কমবেশি সত্যি হয়েছে। কিন্তু সমবেতভাবে হল না। ভালবাসার শহরে থেকেও হল না। রাত এগারোটা-বারোটায় এখনও বছরে তিন-চারবার করে আমার ফোন বেজে ওঠে। জয়ের ফোন।

কে জানে, তাদের তারগুলো সরকারি ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানোর জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তারা অনুমতি নেয় কি না। আমরা তো সেই বেআইনি কাজ করব না বলেই স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বপ্নটাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর একে একে কর্মজীবনের ডাকে শহর ছাড়তে ছাড়তে বন্ধুদের সেই গ্রুপটা ছড়িয়ে গেল ভারতের নানা প্রান্তে। এত বছরে স্বপ্ন সবারই কমবেশি সত্যি হয়েছে। কিন্তু সমবেতভাবে হল না। ভালবাসার শহরে থেকেও হল না। রাত এগারোটা-বারোটায় এখনও বছরে তিন-চারবার করে আমার ফোন বেজে ওঠে। জয়ের ফোন। আবেগে আপ্লুত স্বরে পাগলের মতো বকবক শুরু করে সে। আজকে তার নিজের ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টের ফ্যাক্টরি রয়েছে মুম্বইয়ে। কিন্তু সাকসেসের চূড়ান্তে পৌঁছেও জলপাইগুড়ির হারানো স্বপ্নের প্রতি মমতা এক বিন্দু হারায়নি।

—জানিস, সত্যজিৎ রায়ের ডকুমেন্টারিটা দেখলাম সুকুমার রায়কে নিয়ে... ইউটিউবে। ভাব তো ওই মণ্ডা ক্লাবের কথা! আমাদেরও তো সেরকমই একটা অ্যাসোসিয়েশন ছিল, ভাই!

—হ্যাঁ রে। সেইসব ছিল বলেই তো আজকের এইসব আছে...

ওর আবেগে সহমত হতে একটুও দ্বিধা হয় না আমার। কারণ নিজেকে আমি নিজে যতটা না আবিষ্কার করেছি, তার চেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছি ওই বন্ধুদের সংসর্গেই। বলতে গেলে, আমার কাছে ওটাই ছিল নিজেকে দুনিয়ার উপযোগী করে তৈরি করে নেওয়ার একটা ইনস্টিটিউট, যার জোরেই জীবনের নানা বাঁক ঘুরে কত অভিজ্ঞতাই না হল। এমনকি, কেব্‌ল টিভি চ্যানেল তৈরির যে অসম্পূর্ণ স্বপ্ন নিয়ে শহরটা ছেড়েছিলাম, গত তিন-চার বছরে সেটাও তো একটু একটু করে বাস্তব হয়েছে।

কিন্তু তবুও হয়ত কোথাও একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে। কখনও কখনও সেটা তীব্রভাবে অনুভব করে বলেই জয়ের মাঝরাতের এই ফোন।

—আমরা আরও ভাল কিছু করতে পারতাম। ঠিকঠাক অপারচুনিটি পেলে, উই কুড হ্যাভ ডান মাচ বেটার...।

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

বৃষ্টি মানেই রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার, প্রেম

বর্ষা হল প্রাণসঞ্চারের কাল, কবিতার কাল। কবিতায় ছাড়া ঘন বর্ষার কথা কি বলা যায়? সেই কালিদাসের মেঘ এখনও ভেসে আসে আমাদের আকাশে। কবিতাও তেমনই ভেসে থাকতে জানে। বৃষ্টি ঝরাতেও জানে। বাংলা কবিতার বৃষ্টিভাণ্ডার বিপুল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি বহুদিন ধরেই প্রবাদের স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। সেই বৃষ্টি-কবিতাটি এখানে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

মেঘের মর্ম বোঝে বসুন্ধরা, মেঘের মর্ম বোঝেন কালিদাস। মেঘের জন্য কেমন উতলা করে রেখেছেন সুন্দরী ধরণিকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে তার শরীরে আগুন জ্বলছে, সে আগুন তার সমস্ত বনস্থলীর হৃদয়ে— দিশি দিশি পরিদগ্ধা ভূময়ঃ পাবকেন। বর্ষণলাভের জন্য সে মুখিয়ে আছে মেঘের দিকে ঋতুসংহারের মেয়েগুলোর মতো— নতুন মেঘের জল গায়ে পড়তেই গায়ে কাঁটা দেয়— নবজল-কণ-সেকাদ্ উদ্‌গতাং রোমরাজীম্। ধরণির এই উত্তপ্ত শরীরের মধ্যে ঝড়ের মেঘ আসে প্রথমে, উথালপাথাল করে দেয় ধরণির আবরণ-আভরণ। ধর্ষকের মতো বর্ষণ করে আপন শক্তি বীর্য ধরণির শরীরে। আগ্রহিণী বসুমতী এতকাল অপেক্ষমাণ যুবতীর মতো গ্রহণ করে মেঘ-পুরুষের তেজ। কালিদাসের বর্ষাভাবনার মধ্যে যে চরম একটা 'ইরটিসিজম' আছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন অন্ধকার।' কে বলেছিলেন? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথ। এমন করে আর কে ভাবতে পারেন, তিনি ছাড়া? কালি নয়, প্রকৃতিকে আহরণ করে সেই রস দিয়ে লিখতেন তিনি। বৃষ্টি আর সভ্যতার গহন প্রেমপর্বের তুমুল আখ্যান নিয়ে লিখেছেন অসংখ্য লেখা। তাই হয়তো তাঁর সৃজনীধারা মিশে যায় বাদলধারার সঙ্গে।

বর্ষা নিয়ে লিখেছেন আলেকজান্ডার ফ্রেটারও। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউ হেব্রাইডিস দ্বীপপুঞ্জে তাঁর জন্ম। ঠাকুরদা এবং বাবা স্কটিশ প্রেসবিটারিয়ান মিশনারি। বাবা চিকিৎসক। সেই ছোট দ্বীপে জল-হাওয়া আর আগ্নেয়গিরির অনুষঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁচা। বাবা নৌকো করে দূর দ্বীপে যেতেন চিকিৎসার কাজে। সে কারণে আবহাওয়ার খোঁজখবর রাখতে হত তাঁকে। ঝড়বাদলের সুলুকসন্ধান রাখতে হত নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই। তাঁর থেকেই আলেকজান্ডার চেরাপুঞ্জির কথা শোনেন। বৃষ্টি পড়ে যেখানে বারো মাস।

ফ্রেটারদের এক পারিবারিক বন্ধু থাকতেন সেই বরিষনমুখরিত জনপদে। তাঁর চিঠি পড়ে আলেকজান্ডার জানতে পেরেছিলেন, চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টির এমনই তোড় যে, ভেজা জমিতে মৃতদের সমাধিস্থ করা যায় না। বুনো মধুর জালায় দেহগুলি ডুবিয়ে রাখা হয়। যখন জমিতে একটু শুকনো ভাব থাকে, তখন তাদের গোর দেওয়া হয়।

তার চল্লিশ বছর পর আলেকজান্ডার পাকিস্তান থেকে চিনের কাশগর অভিমুখে চলেছেন। কারাকোরাম হাইওয়ে দিয়ে তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। লন্ডনে ফিরে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। টের পান, তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব অবশ হয়ে আসছে। চিকিৎসা শুরু হয়। রাস্তায় ক্রমাগত ঝাঁকুনির

ফলে হুইপল্যাশ ইনজুরি। গলায় বেঢপ কলার পরে ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁকে। বাড়ে মদ্যপানের মাত্রা। সেই কালান্তক সময়ে হাসপাতালে আলেকজান্ডারের আলাপ হয় অ্যালয়সিয়াস ব্যাপটিস্টা এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। গোয়ার বাসিন্দা তাঁরা। তাঁদের গল্প শুনে আলেকজান্ডারের মনের মধ্যে জেগে ওঠে প্রশান্ত মহাসাগরের সেই ছোট্ট দ্বীপের স্মৃতি। সেই অঝোর বৃষ্টি, বিস্তীর্ণ সবুজ, ফুঁসে ওঠা সমুদ্র। আলেকজান্ডার স্থির করেন, তিনি বর্ষার পিছু নেবেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে। তার ফসল— 'চেজিং দ্য মনসুন'।

বৃষ্টি নিয়ে বলতে গেলে আমেরিকান লেখক জন বারো'জ-এর কথা বলতে হয়। তিনিও লিখতে ভালবাসতেন প্রকৃতি নিয়ে। ১৮৭৮ সালের স্ক্রাইবনার ম্যাগাজিনে ন'পাতা জুড়ে তিনি একরকম বর্ষামঙ্গল কাব্যই লিখেছিলেন বলা যায়। সেখান থেকে দু'টি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা যায়— রোদ্দুরে প্রকাশ, আধিপত্য তো সর্বত্র, তবে জীবন পসরা সাজায় শুধুই সে পথে, যেখানে ছুঁয়ে যায় বৃষ্টিজল অথবা শিশিরবিন্দু।

বৃষ্টির সঙ্গে ডুয়ার্সবাসীর বেশ আবেগঘন প্রেমপর্ব চিরকালের। ঘোরতর অভাবীর সংসারে যেমন ঈশ্বরদর্শনের আকুতি, তপ্ত নিদাঘের পর বর্ষা চেয়ে ঠিক একই রকম ঐকান্তিক প্রার্থনা ডুয়ার্সের মানুষেরও। যখন মাটির শরীর-মন শুষ্ক হতে হতে বিচ্ছিন্ন ধুলোতে পরিণত, যখন ঝরনাধারা বিলুপ্তির পথে ধাবমান, যখন ব্যাঙেদের কোলাহল শ্রুতির অতীত, যখন মরা মাছেরা শুকিয়ে যাওয়া নদীতে ক্ষয়িষ্ণুপ্রায়— সেই পরম ক্ষণে বর্ষার অবাধ প্রবেশ অধিকার। অঝোর বর্ষণ তখন আমাদের কাছে নিয়ে আসে অমোঘ শান্তির জল। রচিত হয় আমাদের প্রেমপর্বের অবধারিত স্বপ্নপূরণ।

যে কথা হচ্ছিল তখন, বর্ষাকে ঘিরে আমাদের চাওয়া-পাওয়া এই বিপুল তরঙ্গকে ছুঁতে চেয়েছিলেন আলেকজান্ডার ফ্রেটার। আবহাওয়া বিজ্ঞানে, পুরনো স্মৃতিকথায়, ব্যক্তিগত ইতিহাসে, পথচলতি মানুষের সঙ্গ গল্পগুজবে। 'চেজিং দ্য মনসুন' নামের বইটি বেরিয়েছিল সিকি শতকের কিছু বেশি সময় আগে। তখন দুনিয়া ছিল অন্যরকম। তখন অচেনা শব্দ পেলে উইকিপিডিয়া ঘাঁটা যেত না। যোগাযোগের ভরসা ছিল টেলিফোন, যাকে আমরা ইদানীং ল্যান্ডলাইন বলে ডাকি। গাড়ি বলতে এক এবং অদ্বিতীয় অ্যাম্বাসাডর। খবর পড়তে হত খবরের কাগজে, স্মার্টফোন বা ট্যাবের স্ক্রিনে নয়। তখন কলকাতা থেকে শিলং যেতে হত বায়ুদূতের ফকার ফ্রেন্ডশিপে। আটের দশকের শেষে উত্তর-পূর্ব ভারত অগ্নিগর্ভ। সরকারি নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে চেরাপুঞ্জি যাওয়া যে কোনও বিদেশির পক্ষেই অসাধ্য।

সেই ছবি বদলেছে, কিন্তু বর্ষার চরিত্র বদলায়নি। সে বরাবরের মতো আজও আশ্চর্যময়ী। তখনকার মতো তার আচার-আচরণ আজও ছকের বাইরে। এহেন নখড়েবাজের পিছু ধাওয়া করা কার্যত অসম্ভব। ভারতে তার প্রবেশ করার পথও দু'দিক দিয়ে— পশ্চিম ও পূর্ব। এইরকম তুঘলকি বস্তুর ধাওয়া করা এমনিতেই কঠিন। আদ্যিকালের প্রযুক্তি দিয়ে আরও বেশি কঠিন। কিন্তু সেখানেই 'চেজিং দ্য মনসুন'-এর স্বাদ, পাঠকের পরিতৃপ্তি। এখনকার মতো স্মার্টফোন, ইন্টারনেট আর জিপিএস দিয়ে সে কাজ বিনা আয়াসে সমাধা করা যায় বটে, কিন্তু তার মধ্যে ভ্রমণরস নেই। নেই গিরিলঙ্ঘনের আনন্দ। ঘোর বর্ষায় ভারতীয় আমলাতন্ত্র, বেহাল রাস্তাঘাট, টেলিফোনের দুর্দশা, অনিয়মিত বিমান, মেঘালয়ে কারফিউ— এসব কিছুর সঙ্গে বর্ষার টাইম টেবিলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কার্যত এভারেস্টে ওঠার চাইতে কোনও অংশে কম নয়। আজও ডুয়ার্সের বৃষ্টি-ভেজা বিকেলে জানালার পাশে বসে গরম চায়ের সঙ্গে এই বইটির পাতা ওলটাতে গেলে সেই অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ মেলে।

শোনা যায়, মায়াসিন যুগে ভারতে প্রথম বর্ষা এসেছিল হিমালয় পর্বতমালা জন্মের ঠিক পরে। তারপর থেকেই মৌসুমি বায়ুর উপর ভর করে চলছে একটা বিরাট উপমহাদেশ। রাইসিনা হিলস থেকে গোবিন্দর চায়ের দোকান— সব জায়গায় একটাই আলোচনা, কবে আসবে বর্ষা। এখানে আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা রাজেন্দ্রনাথ গোলদারের নাম প্রায় বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের মতো লোকমুখে ফেরে।

'লে মিজেরাবল'-এ ভিক্টর উগো বলেছিলেন, যদি না হত অঝোর বর্ষণ, ইউরোপের ইতিহাসটাই হয়ত যেত বদলে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে হয়ত পতন হত না নেপোলিয়ানের। শেষ হত না ফরাসি কর্তৃত্বের। দুর্দান্ত ও অনন্ত বৃষ্টি প্রতিপক্ষ প্রাশিয়ানদের প্রাথমিক বিধ্বস্ততা থেকে নাকি সামলে নিতে সাহায্য করেছিল বেশ। এই প্রসঙ্গে উগো লিখলেন কিছু অমর লাইন— Providence needed only a little rain… an unreasonable cloud crossing the sky sufficed for the overthrow of a world…

বৃষ্টি আমাদের সভ্যতাকে নানা রূপে আকার দিয়েছে। হয় লালন করেছে পরম যত্নে, নয়ত উলটো মেরুতে গিয়ে ভেঙেছে আনখশির। সিন্থিয়া বার্নেটের 'রেনঃ আ ন্যাচারাল অ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি' বই যাঁরা ঘেঁটেছেন, তাঁরাই জানেন, বৃষ্টির বর্ণময় এক আখ্যান ধরা আছে সে বইয়ের ছত্রে ছত্রে। সিন্থিয়া রেনমেকিং-এর ইতিহাস গল্পের ছলে বলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় অপারেশন পপাইয়ের ক্লাউড সিডিং নিয়েও চমৎকার অধ্যায় রয়েছে এ বইয়ে। কর্পোরেট আগ্রাসনের জোয়ার যে শেষ অবধি সম্ভবত অতিকায় এক কৃষ্ণগহ্বরের দিকে যাত্রা, সেটাও সিন্থিয়া ইঙ্গিত করেন মর্মান্তিক ঢঙে।

সিন্থিয়ার চেরাপুঞ্জির বর্ষা পরিক্রমা, আলেকজান্ডার ফ্রেটারের ঠিক এই অংশের পূর্ব অভিজ্ঞতা, ফলে সিন্থিয়ার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে পড়তে বেশ লাগে। তবে সিন্থিয়ার ভারতদর্শনের সেরা নিদর্শন, কনৌজের গলি পেরিয়ে এমন এক পরিবারের অন্বেষণ করেছেন সিন্থিয়া, যারা গত চার প্রজন্ম ধরে আতর বানায়। প্রথম বৃষ্টি মাটিতে পড়ার গন্ধ— petrichor। যে গন্ধ নাকি এ দেশের গন্ধ, তাকে কীভাবে বোতলবন্দি করা হয়, তা সিন্থিয়ার এই পরম যত্নে বলা গল্প না পড়লে জানা হয় না।

মেঘের মর্ম বোঝে বসুন্ধরা, মেঘের মর্ম বোঝেন কালিদাস। মেঘের জন্য কেমন উতলা করে রেখেছেন সুন্দরী ধরণিকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে তার শরীরে আগুন জ্বলছে, সে আগুন তার সমস্ত বনস্থলীর হৃদয়ে—

রাজবংশী ব্রতনাট্য

এক শীত-বিকেলে যে বাড়িটায় গেলাম, সেটি গ্রাম্য হলেও তার মেঝে ইট-গাঁথা, কাঠের ফ্রেমের মধ্যে বাঁশবেড়ার গায়ে পাতলা সিমেন্ট-গোলা লেপা, টিনের চাল। বাড়ির সামনে ছোট্ট মালিচ্যাগারের ভিতর জংলি গোলাপের কেয়ারি।

আমার আগেপিছে একপাল বৃদ্ধা-মহিলা-কিশোরী ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়ছিল গৃহকর্তার উঠোনে। বেলাবেলি ঘরকন্না শেষ করে একটু সাজুগুজু সেরে এসেছে সবাই। নিস্তরঙ্গ জীবনে এই সামান্য উপলক্ষই বিরাট উৎসবের শামিল।

মারেয়ার ঝকমকে নিকানো উঠোনের ঠিক মাঝখানে শামিয়ানা টাঙানো। সাঁঝ নামতেই তিন-চারখানা হ্যাজাক-হ্যারিকেন বসিয়ে দেওয়া হল। চাঁদোয়ার নিচে গিদালির গাওনা মঞ্চ। মঞ্চ বলতে একটা নিচু চৌকির উপর শতরঞ্চি বিছানো। তার সামনে কিছুটা জায়গা ছেড়ে খড়, বস্তা, পলিথিন পেতে অতিথি দর্শকের বসার ব্যবস্থা। করুণ অথচ কী আন্তরিক! অতিথি তো দেবতাই বটেন, নাকি?

ধীরে ধীরে ভরে উঠল দর্শকাসন। গৃহকর্তার ব্যস্ততার সীমা নেই, অকাতরে চা-পানি বিলাচ্ছেন। মুখের বিড়িটিড়ি ফেলে বায়েনরা মঞ্চে বসলেন। গিদালির দোহারও গলার মাফলার গুছিয়ে বসলেন। ঢোলে কাঠি পড়ল— ট্রাক ডুম ডুম! হারমনিয়ামে আঙুল নড়ল— অঁ অঁ অঁ! মঞ্জীরার খচাখন মুখাবাঁশির উ উ উ... শ্রোতারা নড়েচড়ে বসেছেন, এবারে পালা শুরু হবে।

হঠাৎ আলো পেয়ে জঙ্গলের পোকারা আলোর গায়ে জমতে লেগেছে। উঠোন বাদ দিলে বাড়ির বাকি অংশ মিশে গিয়েছে আঁধারে। হায় রে ব্রতনাট্যের মঞ্চ! ধার করা নাচনকোঁদন কত লক্ষ ওয়াটের আলো, মাইক, অডিয়েন্স, ক্ল্যাপস পায়, আর তোমার মতন খাঁটি কৃষ্টির জন্য বিজনভুমের নিশুতি আঁধার!

গিদালি আসর বন্দনা করলেন। নামানি বসানি ভজনা মণ্ডপঘরের শুদ্ধি মণ্ডপজাগানি শান্তিস্বস্ত্যয়ন চহর ধরা চহর ফেলা জল দেওয়া ডাঙা ধরা এমন কত গীত-নৃত্য-সংলাপ-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন একটি ব্রতকাহিনি। শ্রোতাদের মধ্যে বসে আমিও মোহমুগ্ধ। মনে হচ্ছিল, কথক যেন পুরাণ, বেদ, শাস্ত্র কাব্যকথা, সুর-তাল-মুদ্রা সবকিছু হাতের মুঠোয় নিয়ে একক অভিনয় করতে উঠেছেন, কী অনায়াসে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন নানা শাস্ত্রের পৃষ্ঠা থেকে, দক্ষতা বুঝি এরই নাম। তাঁর নিপুণ পরিবেশনায় গৃহকর্তার উঠোনে নেমে এলেন ব্রতের চরিত্ররা। গায়েন, বায়েন, দোহারের তালমেল এত সুন্দর মেলানো, কোথাও এতটুকু হোঁচট নেই। তাঁরা হাসছেন, শ্রোতারাও হাসছেন। তাঁরা কান্নার আবহ ধরেছেন, শ্রোতারাও চোখ মুছছেন। ঝগড়ায় ভ্রূকুটি করছেন, মিলন দৃশ্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে সায় দিচ্ছেন। বুঝতে পারছিলাম, লোকনাট্যে নট-নটীও যতখানি, দর্শক-শ্রোতারাও ততখানিই অংশী।

তবে সবচেয়ে বড় পাওনা হল একেবারে শেষে। রাত শেষ করে পালা ভাঙল। ভাঙল দর্শকভরা অতিকায় মৌচাকটাও। শিশির-ভেজা পাথুরে পথ ধরলাম, আগেপিছে অজস্র অচেনা মানুষ। উত্তুরে বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে, বড় সড়ক এল বলে। পিছনের মানুষগুলোর মধ্যে আলোচনা শুনছি, গিদালির অভিনয়, ঢোলবাদকের হাতযশ, কাহিনির ওঠাপড়া, এমনকি খোসাগানের গুনগুন সুরও। নিঃসঙ্গ অসমর্থ মানুষগুলির জীবনপথের পাড়ানির কড়ি হয়ে উঠেছে ব্রতনাট্য-ব্রতগান।

এখানেই তো সে সার্থক!

আসলে যে ব্রতগুলি শাস্ত্র বইয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সেগুলিতে ঠাকুর-দেবতার কথা যত বলা আছে, পাপপুণ্যের কথা যত লেখা আছে, মাটির বাড়ির সাদা আজলা মানুষের কথা তত লেখা নেই, বলা নেই। অথচ যে ব্রতগুলি রাজবংশী সমাজের জীবনযাত্রার ছাপ গায়ে মেখে নিয়ে চলছে, তাদের কী করে এড়ানো যাবে? ব্রতকথা বা ব্রতের ছড়াগুলি যখন সুর কেটে শোনানো

হচ্ছে, তখন তার মধ্যে ফুটে উঠছে অভিনয়, নাটকীয়তা। এগুলিকে হয়ত নিয়মমাফিক নাটক বলা যাবে না, কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি, অভিনয় দৃশ্যান্তর ইত্যাদি রয়ে গিয়েছে অতএব নাট্যাংশ বা অঙ্গনাট্য তো বটেই। ফারাক একটাই, নাটকে স্ক্রিপ্টের ডিমান্ড অনুযায়ী গান বা সুরকে আশ্রয় করা হয়, এখানে গান-ছড়া ইত্যাদিকে গেঁথে তোলার জন্য নাটকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ এক বিশিষ্ট ধারার নাট্যরীতি।

লোকনাট্যের যা কিছু ব্যাকরণ থাকে, ব্রতনাট্যে তা না-ও থাকতে পারে, কারণ এটি ধর্মাচরণের অঙ্গ। পূজাপার্বণ এবং দেবমহিমা প্রচারই এর আসল উদ্দেশ্য। তা ছাড়াও প্রাচীন শব্দভাণ্ডারের দুরূহ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ঠাকুর-দেবতার সৃষ্টিতত্ত্ব ঠিকঠাক বলতে না পারলে পাপতাপেরও ভয় আছে, অভিনয়ের সঙ্গে চরিত্রচিত্রণের শুদ্ধতাও জরুরি।

একটা সময় প্রাচীন কামতা রাজ্যে হুদম পূজার গীতের প্রচলন ছিল। ব্রতনাট্যের বুঝি সেটিই সূত্রপাত। প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করতে খরার ঋতুতে চরম অনাবৃষ্টির কালে অন্ধকার রাত্রে কোনও এক রোদ-ফাটা খেতের মাঝখানে হুদুম নাচের আয়োজন হত। মহিলা ব্রতীরা উদোম হয়ে নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে নকল হালকৃষি অভিনয় করতেন। মাটি চাষ করা, বীজ বোনা, এমনকি রমণের ইচ্ছায় ইন্দ্রদেবতা মনে করে কলা গাছকে আলিঙ্গন করাও ছিল এই অভিনয়ের অংশ। প্রায় পাঁচশো বছর আগে কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের কুমারী মেয়েরা কাত্যায়নী ব্রত করত। ব্রতের আয়োজন, স্নান, পুজো সেরে রাতভর শিব-পার্বতীর বিয়ের গান এবং অভিনয় চলত। মেয়েরা কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী সাজত না। যেভাবে আছে, সেভাবেই গৌরী, মহাদেব, সখী, নারদ, মেনকা, বরযাত্রী ইত্যাদির অভিনয় করত। কথার পিঠে কথা, গানের সঙ্গে গান, পাশা খেলার দৃশ্যে ঝগড়া, হাসিঠাট্টা, কান্না-হিংসা— এ সবকিছু লক্ষ করে তুলনা আসে পাতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলা এবং পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতে উল্লেখ করা নাটকীয়তার কথা।

ধর্মের ভিত্তিতে নারীর অন্দরমহলে অঙ্গনাট্য নতুন নয়। নিম্ন আসামের গাঁয়ের মেয়েরা পচতি নামে এক ধরনের সুন্দর নাটক করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণর জন্মদিনে অর্থাৎ জন্মাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে এই নাটক অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও কেবল মেয়েরাই অংশ নেয়। গান গাইতে গাইতে নবজাত কৃষ্ণর গায়ে তেল-হলুদ এবং দইয়ের জল ছেটানোর অভিনয় চলে। এর মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত হয় গর্গঋষি চরিত্রধারী নারী। পঞ্জিকা, আসন, কমণ্ডলু সবই থাকে তার হাতে। গর্গরাজ নবজাত শিশুর নামকরণ করেন এবং পচতি সমাপ্ত হয়।

আসাম, বাংলাদেশের রংপুর এবং অবশ্যই উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে রাজবংশী মহিলারা কাতিপূজাব্রতের গান পরিবেশন করেন, যেটিকে লোকনাট্য আখ্যা না দিয়ে উপায় নেই। চাষবাস ভাল হবে, আবার ঘরে সন্তান আসবে অর্থাৎ উর্বরতা ও প্রজননের কামনায় কাতিব্রতের আয়োজন। শিব ও চণ্ডীর মিলন কাহিনি থেকে শুরু করে কার্তিকের জন্ম পর্যন্ত অভিনয় করেন ব্রতীরা। গান আর অভিনয়ের মধ্যে আরেকটি চমৎকার বিষয় থাকে, চণ্ডীর প্রতি মাসের গর্ভকাল ধরে ধরে একটি লম্বা সুতোয় ফাঁস গিঁট দেওয়া হয়। দশ মাসের দশটি গিঁট দেওয়া হলে কাতির জন্ম নেবার রূপক হিসেবে এক টানে দশটি গিঁটই খুলে ফেলা হয়, তখন ধাই আসে, নাড়ি কাটে, সন্তানকে ধোয়ায়-মোছায়, অশৌচ তোলে— অর্থাৎ সবকিছুই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দৃশ্যায়িত হয়।

কখনও কখনও কাতিব্রতের গীতাভিনয়ে পরিবেশিত হয় কৃষিকাজ। পুরুষের সাজ ধরে মেয়েরা কাঁধে লাঙল নিয়ে খেতি করতে থাকে। দু'টি ছোট মেয়ে হাঁটু গেড়ে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে গোরুর অভিনয়ে আসরে নামে। এরা হয় হালের গোরু। চাষি কাঁধের লাঙল রেখে গোরুর ঘাড়ে হাল জুড়ে দেয়। এর মধ্যে 'বাঘ এসেছে' 'বাঘ গোরু নিয়ে গেল' ইত্যাদি রব ওঠে। চারদিকে ধুন্ধুমার লেগে যায়। পুরুষবেশী মহিলারা লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে বাঘ তাড়িয়ে গোরু উদ্ধার করে। ফসলরক্ষার জন্য কয়েকটি মেয়ে তির-ধনুক হাতে নিয়ে বাদুড় তাড়ানোর অভিনয় করে। নাট্যাংশে সংলাপ তেমন নেই, কিন্তু ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে অভিনয় আছে ষোলো আনা।

দেবমাহাত্ম্য বা দৈবশক্তি প্রচার করার জন্য একদা যে স্তব বা বন্দনাগানের জন্ম হয়েছিল, তারই সংস্কারিত শাখাকে বলতে চাইছি অঙ্গনাট্য, ব্রতনাট্য। জানি না পাঠক একমত হবেন কি না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্রতের মঞ্চায়ন করে দেখেছি, দর্শকসমাজে তা খুবই আদর পায়। উত্তরভূমির গ্রাম, লোকালয়, জনজাতি, জনগোষ্ঠী যদি কীর্তনীয়া, গিদালি, বাউল, বৈরাগী, কুশানি, লোকনট প্রমুখের জন্ম দিতে পারে, তবে ব্রতনাট্য শিল্পীরাই বা দিতে পারবে না কেন, ভাববার সময় হয়েছে। সরকার লোকশিল্পের যত্নে মনোযোগী হয়েছেন, এখন শুধু প্রয়োজন এই শিল্পটি চর্চা করার উদ্যোগ। দক্ষ ও পেশাদার নাট্য নির্দেশকের পরিচালনা পেলে হয়ত একদিন উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পও হয়ে উঠতে পারে এই ব্রতনাট্য।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

আবৃত্তি দিয়ে রোগ সারিয়ে তুলছেন শিলিগুড়ির এক চিকিৎসক

কেউ তাঁর কাছে বাতব্যথা, পঙ্গুত্ব নিয়ে এলে তিনি তাঁর চিকিৎসা করেন। এরই পাশাপাশি শরীরের ব্যথা নিয়ে আসা রোগীদের মধ্যে অনেককেই আবৃত্তি, সংগীতের অনুশীলন বাড়িয়ে তাঁদের ব্যথা সারিয়ে তুলছেন তিনি। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা, আবৃত্তির প্রসার বাড়িয়েও তিনি বিভিন্ন মহলে সুনাম অর্জন করছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার পার্থপ্রতিম পানের এই অন্যরকম সংস্কৃতি ও চিকিৎসা বিভিন্ন মহলে আলোচনার দিক হয়ে উঠেছে। ছোট থেকেই আবৃত্তিচর্চা করেন ডাক্তার পান। বাড়ি তাঁর মেদিনীপুরে। ২০০২ সালে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কাজে যোগ দেন চিকিৎসক হিসাবে। আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটকের নিবিড় শিল্পসাধনার জন্য ২০০৯ সালে তিনি শিলিগুড়িতে তৈরি করেন কথা ও কবিতা। আবৃত্তিচর্চার জন্য তিনি দিনরাত কাজ করে চলেছেন। পরবর্তী প্রজন্মকে আবৃত্তিশিল্পে উৎসাহিত করার জন্য সম্প্রতি শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হলে 'কথা ও কবিতা' আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ৮ জুলাই শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে একক ও সম্মিলিত আবৃত্তি ছাড়াও নতুন বাচিক আঙ্গিক শ্রুতিগল্প আয়োজন করা হয়। সেখানে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে প্রখ্যাত আবৃত্তিকার সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে 'কথা ও কবিতা' সম্মানে সম্মানিত করা হয় ২০১৬-তে টেলি সম্মান বিজয়ী চিত্রনাট্যকার ঋতম ঘোষালকে। ৯ জুলাই স্টেডিয়াম হলে শ্রুতিরহস্য সন্ধ্যা 'কথা ও কবিতা'র নিজস্ব প্রযোজনা ছাড়াও ছিল উত্তরবঙ্গের তিনটি

বিশিষ্ট দলের শ্রুতিনাটক। শুধুমাত্র রহস্য গল্পের উপর নির্ভর করে এইরকম নাট্য সন্ধ্যা বাংলায় প্রথম বলে দাবি করেন 'কথা ও কবিতা'র কর্মকর্তা ডাক্তার পার্থপ্রতিম পান। এইভাবে আবৃত্তি ও নাটকের প্রসার ছাড়াও ডাক্তার পান রোগী দেখার সময় লক্ষ করেন, কোনও রোগীকে ওষুধ না দিয়ে স্রেফ আবৃত্তি ও গান দিয়ে সুস্থ করে তোলা যায় কি না। অনেক রোগী আছেন, যাঁরা মানসিক, সাইকোসোমাটিক রোগে ভুগছেন। ব্যথা নেই কিন্তু ব্যথা, ব্যথা বলতে থাকেন। তাঁদেরকে তিনি কোনও ওষুধ না দিয়ে আবৃত্তি ও সংগীত দিয়ে এক বিরাট ফল পেয়েছেন। তাঁর কথায়, অনেক রোগী তাঁকে ব্যথা দেখাতে এসে ব্যথা ভুলে তাঁর কাছে আবৃত্তি শিখতে শুরু করেছেন। যেমন পপি কুণ্ডু। তাঁর কাছে আবৃত্তিচর্চা করতে থাকা মিতালি বিশ্বাস বলেন, চারদিকে মনের যন্ত্রণা বা স্ট্রেস বাড়তে থাকায় আবৃত্তি বা সংস্কৃতিচর্চা বড় ওষুধ হতে পারে। শিলিগুড়িসহ উত্তরবঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক দিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন ডাক্তার পান। বহু ডাক্তার যখন শুধু সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে অত না ভেবে নিজেদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে ভেবে চলেছেন, তখন এই ডাক্তার রীতিমতো দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক বি বাতসব বলেন, ডাক্তার পান একজন বিরল চিকিৎসক, যিনি রোগীদের রোগের চিকিৎসা করার পাশাপাশি তাঁদের আবার সুস্থ সংস্কৃতিমুখী করে তোলার প্রয়াস নেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

'অদ্ভুতং'-এর ১০০

কোনও নাটকের ১০০টা শো করা মুখের কথা নয়। কোচবিহার ইন্দ্রায়ুধ নাট্যগোষ্ঠী এমনই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাল। গত ১৬ জুলাই রবিবার স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ হল 'অদ্ভুতং' নাটকের শততম শো। ১৯৮৭ সালের ১৪ অক্টোবর দিনহাটায় দীপায়ন ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয়েছিল। এর পর তাদের নানান প্রযোজনার পাশাপাশি এই নাটকটিও চলতে থাকে। কোচবিহারের বিভিন্ন মহকুমা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মঞ্চস্থ হয়েছে 'অদ্ভুতং'। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর, মুম্বইতেও নাটকটি দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

এ দিন নাটকটির শততম মঞ্চায়ন ঘিরে গোষ্ঠীর কলাকুশলীদের আবেগ ছিল তুঙ্গে। মঞ্চে এই সন্ধেয় তাঁরা ডেকেছিলেন সেইসব কুশীলবকে, যাঁরা কোনও না কোনও সময় নাটকটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৪০ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ জন। প্রত্যেককের এ দিন সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের এই অংশটি প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যর পাশাপাশি দর্শকদেরও হৃদয়কে ছুঁয়ে গিয়েছে। একমাত্র দীপায়ন ভট্টাচার্য 'অদ্ভুতং'-এর ১০০টি শো-তেই অভিনয় করেছেন বলে জানালেন দলের এক সদস্য। জল দূষণ ও অরণ্য নিধনের বিরুদ্ধে বার্তা পৌঁছানোর লক্ষ্যে রচিত এই নাটক আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

নাচে-গানে-নাটকে এ দিনের সন্ধ্যা সত্যিই ভিন্ন স্বাদের ছিল।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বহিরাগত শিল্পীদের জন্য মার খাচ্ছে স্থানীয় প্রতিমা নির্মাণ শিল্পীরা!!

প্রতীক্ষার আর কয়েকদিন। তারপরই ২৬ সেপ্টেম্বর মায়ের বোধন দিয়ে শুরু হবে শারদীয়া দুর্গোৎসবের। এ বছর দুর্গা পুজোর সময়সীমা বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে পঞ্জিকা অনুযায়ী। তাই গোটা রাজ্যের পাশাপাশি জলপাইগুড়িতেও মৃৎশিল্পালয়গুলিতে প্রতিমা নির্মাণের কাজ জোরকদমেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন চলছে খড়-বাঁশের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপের কাজ।

ইতিমধ্যে শহর জলপাইগুড়িতে ভাল ব্যবসা করার আশায় প্রথমবার অস্থায়ী শিবির করেছেন বর্ধমানের কাটোয়া থেকে আসা শিল্পীরা। শহরতলি এলাকায় আসাম মোড় সংলগ্ন মুন্ডা বস্তিতে তাঁদের কারখানা গড়েছেন কাটোয়ার শিল্পী ভুবন পাল। এর আগেও তিনি দু'বার জলপাইগুড়িতে প্রতিমা নির্মাণের কাজ করে গিয়েছেন। সেবার কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী মনোজিৎ দাসের সঙ্গে সহায়ক শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। তবে এবার তিনি নিজের উদ্যোগেই প্রথমবার এই শহরে কারখানা শুরু করলেন। তাঁর মতে, জলপাইগুড়িতে বহিরাগত, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীদের তৈরি দেবীপ্রতিমার কদর বেশি। সেই চাহিদাকে সামনে রেখে তিনি এখানে এলেন। তাঁরই নেতৃত্বে এখন জলপাইগুড়ির এই কারখানায় প্রতিমা গড়ার কাজ করছেন কাটোয়ারই প্রশান্ত পাল, নারায়ণ দাস।

এ ছাড়াও বারাসতের লক্ষ্মণ পাল এবং মুর্শিদাবাদের উৎপল সাহারাও এসেছেন ভুবনকে সহযোগিতা করতে। ইতিমধ্যে তাঁদের মৃৎশিল্পালয়ে শহর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন পুজো কমিটি প্রতিমার বরাত দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। এ বছর তাঁরা মোট ১৫টি প্রতিমা গড়ছেন। তাঁদের প্রতিমার মূল্য রাখা হয়েছে ৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

শিল্পী ভুবন পাল জানান, প্রতিমা গড়ার মাটি তাঁরা মালদা থেকে নিয়ে এসেছেন। প্রতিমার কাপড় ও অলংকারাদি তাঁরা কলকাতা থেকে আনবেন। তাঁর মতে, তাঁদের দেবীপ্রতিমার নির্মাণশৈলীর ধাঁচ এখানকার স্থানীয় শিল্পীদের চাইতে অনেক উন্নত। সে কারণে এবার তাঁদের তৈরি প্রতিমা বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আগামীতে তাঁরা প্রতিমা নির্মাণের সংখ্যা আরও বাড়াবেন বলে জানান।

এ বছর কালী পুজো পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে থেকে কালীপ্রতিমাও নির্মাণের লক্ষ্য রয়েছে কাটোয়ার এই শিল্পীদের।

বহিরাগত এই শিল্পীদের আগমনে খানিকটা হলেও চিন্তিত জলপাইগুড়ির স্থানীয় শিল্পীরা। শহরের প্রবীণ মৃৎশিল্পী জীবন পাল প্রায় ৩৫ বছর ধরে প্রতিমা গড়ার কাজ করছেন। অরবিন্দনগর এলাকায় তাঁর একটি বড় মাপের শিল্পালয় রয়েছে। এ বছর তিনি ৩৫টি দেবীপ্রতিমা গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছেন। প্রবীণ এই শিল্পী আক্ষেপ করে বলেন, 'গাঁয়ের ফকির নিজের গাঁয়ে ভিক্ষে পায় না।'— এই অবস্থা তাঁদের মতো স্থানীয় শিল্পীদের।

শহরের বড় বাজেটের পুজো কমিটিগুলি এখন তাদের পুজোর স্টেটাস বাড়াতে বাইরের শিল্পীদের দিকে ঝুঁকছে। তাঁর অভিযোগ, বহিরাগত শিল্পীদের তৈরি প্রতিমা মোটা টাকায় কিনলেও স্থানীয় শিল্পীদের টাকাই দিতে চায় না বিগ বাজেট পুজো কমিটিগুলি। এমনিতে গত কয়েক বছরে প্রতিমা নির্মাণের খরচ বহুগুণ বেড়েছে। বাঁশ, খড়, মাটি, কাপড়, রং— প্রতিটি নির্মাণসামগ্রীর দাম এখন আকাশ-ছোঁয়া। এদিকে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও প্রতিমা নির্মাণশিল্পের কাজে আগ্রহী হচ্ছে না। এ কারণে এখন জেলায় মৃৎশিল্পালয়ের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের মৃৎশিল্পীদের হাতেই রাজ্য জুড়ে এই শিল্পের প্রায় একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম হচ্ছে বলেই আক্ষেপ প্রবীণ এই মৃৎশিল্পীর।

শুভ্রজিৎ পোদ্দার

ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন

অরবিন্দ কর আর কিরাতভূমি সমার্থক দুই নাম

নীলোৎপল জোয়ারদার লেখক এবং একাধারে 'উত্তরদেশ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। একসময় স্কুলে পড়াতেন, অবসর নিয়েছেন বহু বছর হল। স্ত্রীবিয়োগ হবার পর বাড়িতে থাকেন কম। বাবরের আমলের একটা নীলচেরঙা স্কুটার আছে তাঁর। সেই ভাঙাচোরা দ্বিচক্রযানে চেপে পত্রিকার কাজে সারাদিন শহরে চরকিপাক মারেন। এহেন নীলোৎপল হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে। ড্রিপ চলছে, অক্সিজেনের মাস্ক পরানো। লোক চিনতে পারছেন না। তবুও সেই আধো-ঘুম, আধো-জাগরণ দশার মধ্যেও তাঁর মাথায় ঘুরছে 'উত্তরদেশ'-এর কথা। অ্যাটেন্ড্যান্ট লোকটিকে ভুল করে ভেবেছেন পত্রিকার ছেলে। তার কাছে আকুতি করে বলছেন, পাল বেকারির কাছে 'উত্তরদেশ'-এর বিজ্ঞাপন বাবদ এক হাজার টাকা পড়ে আছে। সেই টাকাটা যাতে মনে করে নিয়ে আসে সে। অ্যাটেন্ড্যান্টের কাছে ঘটনাটা শুনে নীলোৎপলের পুত্রবধূর বিস্ময় আকাশ-ছোঁয়া। পত্রিকা নিয়ে একটা মানুষের অবসেশন কোন পর্যায়ে গেলে এমনটা হওয়া সম্ভব!

'দেশ' পত্রিকায় 'শিবময়' নামে এই কলমচির একটি গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পের প্রোটাগনিস্ট ছিলেন নীলোৎপল জোয়ারদার। গল্পটি প্রকাশ পাবার পর বেশ কিছু মানুষের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল। অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, নীলোৎপল জোয়ারদার চরিত্রটা কি বাস্তব থেকে নেওয়া? নীলোৎপল কি আসলে 'কিরাতভূমি' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ কর?

এমন ধারণা হওয়ার কারণ আছে। কর বাড়িতে আমার যাতায়াত সেই যখন কলেজে পড়ি, তখন থেকে। ওঁর একমাত্র পুত্র বাপ্পাদিত্য আমাদের ছোটবেলার বন্ধু। সংস্কৃতিপাড়ার কর বাড়ির মেজেনাইন ফ্লোরের এক চিলতে ঘরটা ছিল বাপ্পার স্টাডিরুম। সে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ দেখিনি কখনও। ভরদুপুরে বা সন্ধেবেলা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে গুটিগুটি উঠে আমরা বন্ধুরা সেঁধিয়ে যেতাম বাপ্পার ঘরে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা সাদা হয়ে থাকত সবসময়। মেঝেতে পড়ে থাকত বিড়ির ছাইয়ের স্তূপ।

সন্ধেবেলার দিকে লক্ষ করতাম, দোতলার ড্রয়িং রুমে সাহিত্যের আসর বসত। শহরের

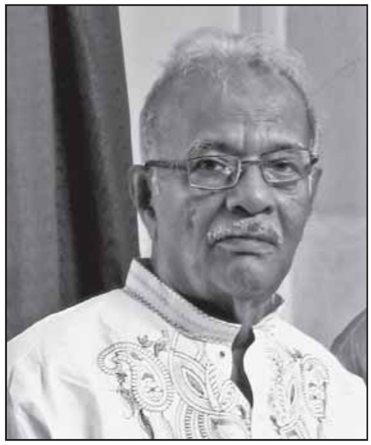

সৃজনশীল মানুষরা একজোট হতেন। জোরদার তর্কবিতর্ক চলত সাহিত্য নিয়ে। পরের সংখ্যার পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চলত। শুনতে পেতাম, কেউ স্বরচিত গল্প পড়ে শোনাচ্ছেন, কেউ সদ্য লেখা কবিতা। এদিকে চায়ের পর চা চলছে। সঙ্গে মুড়ি-তেলেভাজা। গমগম করছে ঘরটা।

কখনও উঁকি দিয়েছি কৌতূহলী হয়ে। উনি স্মিতমুখে বলেছেন, আয়, ভিতরে আয়। আমি সলজ্জে এবং সভয়ে পিঠটান দিয়েছি। একদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে আচমকা। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছেন, কলেজে পড়িস, এটাই তো কবিতা লেখার বয়স, তুই কবিতা লিখিস না? আমাদের পত্রিকায় একটা ছোট মাপের কবিতা লিখে দে। তখন চুটিয়ে ক্রিকেট খেলি, আর দেদারসে গল্পের বই পড়ি। নিজে যে কোনও দিন দু'লাইন লিখব, সেটা তখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। আমতা আমতা করে বলেছিলাম, আমি কবিতা লিখতে পারি না। উনি হেসে বলেছিলেন, কবিতাই লিখতে হবে এমন কোনও কথা নেই। ইচ্ছে করলে গল্পও লিখতে পারিস। দু'পাতার মধ্যে একটা ছিমছাম গল্প লিখে দে। আমি ঢক করে ঘাড় কাত করে বলেছিলাম, আচ্ছা, চেষ্টা করব। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, 'কিরাতভূমি' পত্রিকায় যেখানে তাবড় লেখকরা লেখেন, সেখানে আমাকে গল্প দিতে হবে— এই ভয়ে বহুদিন ওই চত্বর মাড়াইনি।

কলেজ থেকে বেরতে না বেরতেই একটা চাকরি পেয়ে যাই। জলপাইগুড়ি শহরেই অফিস। উনি বাবরের আমলের স্কুটারে চেপে আসতেন আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে, যদি কিছু সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। তখন উনি জলপাইগুড়ি জেলার উপর দু'হাজার পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করার জন্য দৌড়ঝাঁপ করছেন। সরকারি সাহায্যের জন্য এ বেলা-ও বেলা ছুটছেন প্রশাসকদের দরজায় দরজায়। মলিন মুখে বলতেন, গাঁটের কড়ি খরচ করে, কষ্ট করে পত্রিকাটা চালাচ্ছি, কিন্তু সরকারি সাহায্য না পেলে দু'হাজার পাতার এই বইটা বার করা যাবে না। অথচ বইটা হলে জলপাইগুড়ির একটা প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সেটা থেকে যাবে। একটু দেখিস তো, যদি দু'-একটা বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিতে পারিস।

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের ডেডিকেশন বা প্যাশনের কথা গল্প-উপন্যাসে পড়ি। কিন্তু অরবিন্দ করকে চোখের সামনে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম যে, সাহিত্যের প্রতি এক-সমুদ্র ভালবাসা না থাকলে এমন হয় না। ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু হয়েছিল 'কিরাতভূমি' পত্রিকার প্রকাশ। দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে টানা প্রকাশ করে গিয়েছেন 'কিরাতভূমি'। নিরবচ্ছিন্নভাবে বেরনো ত্রৈমাসিক এই পত্রিকা ঋদ্ধ হয়েছে অশোক বসু, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দগোপাল ঘোষ, উমেশ শর্মার মতো শক্তিশালী লেখক ও প্রাবন্ধিকের লেখায়। এই পত্রিকা হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের অনেক যশস্বী কবির আঁতুড়ঘর। নিজে সাদামাটা ঘরোয়া জীবন নিয়ে গল্প লিখতেন। কিন্তু যত দিন গিয়েছে, লেখক পরিচয় ছাপিয়ে তাঁর সম্পাদক পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে ক্রমশ। সম্পাদকের ছায়ায় তাঁর লেখকসত্তা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর ভূতের মতো পরিশ্রমের ফসল ফলেছে। 'কিরাতভূমি' পত্রিকার সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। কলকাতার সাহিত্যরসিক মহলেও পৌঁছে গিয়েছে 'কিরাতভূমি'র সুঘ্রাণ।

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। মাঝে দু'বার শিলিগুড়ির একটি নার্সিং হোমে ভরতি হয়েছিলেন, আবার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ১৮ জুলাই দুপুরে হার্ট অ্যাটাকের ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। চোখ বুজলেন চিরকালের মতো। শ্মশানে তাঁর নশ্বর দেহ দাহ করে ফিরে আসার সময় বারবার মনে হচ্ছিল, 'কিরাতভূমি' পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার এবার কার উপর ন্যস্ত হবে? অরবিন্দ কর আর 'কিরাতভূমি'— এই দুটো নাম যে সমার্থক ছিল এতদিন!

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস
চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৫। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

মাতাল থেকে নির্জন কিছু পেল
মনে হচ্ছে বাগচিবাবু লেডি চিতার খপ্পরে পড়েছেন। একটা ঝুঁকি নিতেই হবে।
তবুও ভাবো সোর্স একটা মাতাল। এর ভিত্তিতে ঝুঁকি নেবে?
হ্যাঁ!
তুমি কিন্তু বলছ যে জঙ্গলের ভিতরে একটা গোপন ডেরা আছে। না থাকলে জেলে যাবে!
চ্যালেঞ্জ!
এদিককার সবরকম দু'নম্বর কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বাংলা খাই বলে কেরিয়ার হয়নি।
ওক্কে! সত্যি হলে বাংলার তিস্তা বইবে। দু'দিন পরেই আসছি। রেডি থাকবে।
বাংলার দিব্যি!
এখন চাই গভীর জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি আর সঙ্গী আর জিনিসপত্র।
দু'দিন পর
আমাদের হাই কমিশন তোমাকে সবরকম অনুমতিই দিয়েছে।
ধন্যবাদ ডেপুটি।
কিন্তু অনুমতি দিলেও বন দপ্তর তোমাকে কোনও সিকিউরিটি দেবে না। তুমি কাউকে নিচ্ছ তো?
সে আর বলতে ডেপুটি!

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-9 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.